GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. B 915
Book No. T479p

N. L. 38.
MGIPC—S1—12 LNL/58—23-5-58—50,000.

শ্রীইন্দিরা দেবী
২৭শে নভেম্বর ১৯৩৭

পাশ্চাত্য ভ্রমণ

পাশ্চাত্য ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

পাশ্চাত্য ভ্রমণ

প্রকাশ পরিচয়

প্রথম সংস্করণ ... আশ্বিন, ১৩৪৩

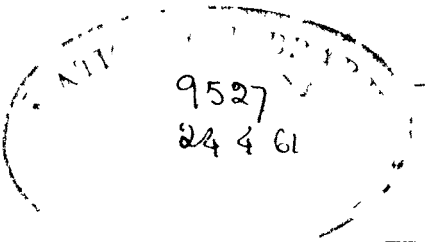

মূল্য—১৲

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত

বন্ধুবরেষু—

আমার বয়স ছিল সতেরো। পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়ে গুরুজনের উদ্বেগভাজন হয়েছি। মেজদাদা তখন আমেদাবাদ জজিয়তি করছেন। ভদ্রঘরের ছেলের মানরক্ষার উপযুক্ত ইংরেজি যে-ক'রে-হোক জানা চাই; সেজন্যে আমার বিলেত নির্ব্বাসন ধার্য্য হয়েছে। মেজদাদার ওখানে কিছুদিন থেকে পত্তন করতে হবে তার প্রথম ভিৎ, হিতৈষীরা এই স্থির করেছেন। সিভিল সর্ভিসের রঙ্গভূমিতে আমার বিলিতি কায়দার নেপথ্যবিধান হোলো।

বালক বয়সে আত্মপ্রকাশটা থাকে চাপা। জীবনে তখন উপর-ওয়ালাদেরই আধিপত্য; চলৎশক্তির স্বাতন্ত্র্যটা দখল করে আদেশ উপদেশ অনুশাসন। স্বভাবত মেনে-চলবার মন আমার নয়, কিন্তু আমি ছিলুম ভোলা মনের মানুষ, আপন খেয়াল নিয়ে থাকতুম, আমাকে দেখতে হোত নেহাৎ ভালো মানুষের মতো। ভাবীকালে বিস্তর কথাই কইতে হয়েছে, তার অঙ্কুরোদ্গম ছিল নিঃশব্দে। একদিন যখন বারান্দার রেলিং ধ'রে একলা চুপ করে বসে ছিলুম, পাশ দিয়ে যেতে যেতে বড়দাদা আমার মাথা নাড়া দিয়ে বললেন, রবি হবে ফিলজফর। চুপ ক'রে থাকার ক্ষেতে ফিলজফি ছাড়াও অন্য ফসল ফলে।

ক্ষেতে প্রথম দেখা দিল কাঁটা গাছ, চাষ-না-করা জমিতে। বিশ্বকে খোঁচা মেরে আপন অস্তিত্ব প্রমাণ করবার সেই ঔদ্ধত্য। হরিণ-বালকের প্রথম শিং উঠলে তার যে চাল হয় সেই উগ্রচাল প্রথমে কৈশোরের।

বালক আপন বাল্যসীমা পেরোবার সময় সীমা লঙ্ঘন করতে চায় লাফ দিয়ে। তার পরিচয় সুরু হয়েছিল মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচনা যখন লিখেছিলেম পনেরো বছর বয়সে। এই সময়েই যাত্রা করেছি বিলেতে। চিঠি যেগুলো লিখেছিলুম তাতে খাঁটি সত্য বলার চেয়ে খাঁটি স্পর্দ্ধা প্রকাশ পেয়েছে প্রবল বেগে। বাঙালির ছেলে প্রথম বিলেতে গেলে তার ভালো লাগবার অনেক কারণ ঘটে। সেটা স্বাভাবিক, সেটা ভালোই। কিন্তু কোমর বেঁধে বাহাদুরি করবার প্রবৃত্তিতে পেয়ে বসলে উল্টো মূর্ত্তি ধরতে হয়। বলতে হয়, আমি অন্য পাঁচজনের মতো নই, আমার ভালো লাগবার যোগ্য কোথাও কিছুই নেই। সেটা যে চিত্তদৈন্যের লজ্জাকর লক্ষণ এবং অর্ব্বাচীন মূঢ়তার শোচনীয় প্রমাণ, সেটা বোঝবার বয়স তখনো হয়নি।

সাহিত্যে সাবালক হওয়ার পর থেকেই ঐ বইটার পরে আমার ধিক্কার জন্মেছিল। বুঝেছি, যে দেশে গিয়েছিলুম সেখানকারই যে সম্মান হানি করা হয়েছে তা নয়, ওটাতে নিজেরই সম্মানহানি। বিস্তর লোকের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও বইটা প্রকাশ করিনি। কিন্তু আমি প্রকাশে বাধা দিলেই ওটা যে অপ্রকাশিত থাকবে এই কৌতূহল-মুখর যুগে তা আশা করা যায় না। সেই জন্যে এ লেখার কোন্ কোন্ অংশকে লেখক স্বয়ং গ্রাহ্য এবং ত্যাজ্য ব'লে স্বীকার করেছে সেটা জানিয়ে রেখে দিলুম। যথাসময়ে ময়লার-ঝুলি হাতে আবর্জ্জনা কুড়োবার লোক আসবে, বাজারে সেগুলো বিক্রি হবার আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে। অনেক অপরাধের অনেক প্রায়শ্চিত্ত বাকি থাকে ইহলোকে, প্রেতলোকে সেগুলো সম্পূর্ণ হোতে থাকে।

এ বইটাকে সাহিত্যের পংক্তিতে আমি বসাতে চাই, ইতিহাসের পংক্তিতে নয়। পাঠ্য জিনিষেরই মূল্য সাহিত্যে, অপাঠ্য জিনিষেরও

মূল্য ইতিহাসে। ঐতিহাসিককে যদি সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে পারতুম তবে আমার পক্ষে সেটা পুণ্যকর্ম্ম, সুতরাং মুক্তির পথ হোত। নিজের কাব্য সম্বন্ধে এই ত্যাগের সাধনায় প্রবৃত্ত হোতে বারবার সঙ্কল্প করেছি। কিন্তু দুর্ব্বল মন, সঙ্ঘবদ্ধ আপত্তির বিরুদ্ধে ব্রত পালন করতে পারিনি। বাছাই করবার ভার দিতে হোলো পরশুপাণি মহাকালের হাতে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের যুগে মহকালেরও কর্ত্তব্যে ত্রুটি ঘটছে। বইগুলির বৈষয়িক স্বত্ব হারিয়েছি ব'লে আরো দুর্ব্বল হোতে হোলো আমাকে।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্চে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারিনে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম। আজ এর বয়স হোলো প্রায় ষাট। সেক্ষেত্রেও আমি ইতিহাসের দোহাই দিয়ে কৈফিয়ৎ দাখিল করব না। আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি-ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।

তারপরে লেখার জঙ্গলগুলো সাফ করবামাত্র দেখা গেল, এর মধ্যে শ্রদ্ধা বস্তুটাই ছিল গোপনে, অশ্রদ্ধাটা উঠেছিল বাহিরে আগাছার মতো নিবিড় হয়ে। আসল জিনিষটাকে তারা আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু নষ্ট করেনি। এইটে আবিষ্কার ক'রে আমার মন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছে! কেননা, নিন্দানৈপুণ্যের প্রাখর্য্য ও চাতুর্য্যকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। ভালো লাগবার শক্তিই বিধাতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মানবজীবনে। সাহিত্যে কুৎসাবিলাসীদের ভোজের দাদন আমি নিইনি, আর কিছু না হোক্, এই পরিচয়টুকু আমি রেখে যেতে চাই।

একটা কথা আপনাকে বলা বাহুল্য। ইংরেজের চেহারা সেদিন আমার চোখে যেমনটা ধরা পড়েছিল সেটা যে নেহাৎ আমার বাল্যবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞতার সৃষ্টি সে কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না।

এই প্রায় ষাট বছরের মধ্যে সেখানকার মানুষের যে পরিবর্ত্তন হয়েছে তাকে ক্রমশ অভিব্যক্তির আখ্যা দেওয়া যায় না। এক-এক সময়ে ইতিহাস-সতরঞ্চের বড়ে তার এক পা চাল ছেড়ে দিয়ে লম্বা চালে চলতে সুরু করে। পাশ্চাত্যে তাই ঘটেছে। সেদিনকার পাসপোর্টে তার যে ছবিটা ছিল সে ছবি আজ একেবারেই চলবে না।

সেই প্রথম বয়সে যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম, ঠিক মুসাফেরের মতো যাইনি। অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে বাহির থেকে চোখ বুলিয়ে যাওয়া বরাদ্দ ছিল না।—ছিলেম অতিথির মতো, ঘরের মধ্যে প্রবেশ পেয়েছিলুম। সেবা পেয়েছি, স্নেহ পেয়েছি, কোথাও কোথাও ঠকেছি, দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু তারপরে আবার যখন সেখানে গিয়েছি, তখন সভায় থেকেছি, ঘরে নয়। আমার তৎপূর্ব্বকালের অভিজ্ঞতা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ যদি বা না হয় তবু সত্য। যে-ডাক্তারের বাড়িতে ছিলুম তিনি ভদ্রশ্রেণীর এবং শ্রদ্ধেয়, কিন্তু সমুদয় ভদ্রশ্রেণীর প্রতীক তিনি না হোতে পারেন। ইংলণ্ডে আজও বর্ণসাম্য যতই থাক শ্রেণীভেদ যথেষ্ট। সেখানে এক শ্রেণীর সঙ্গে আর এক শ্রেণীর মনোবৃত্তি ও ব্যবহারের মিল না থাকাই স্বাভাবিক। সেদিনও নিঃসন্দেহ ছিল না। আমি সেদিনকার সাধারণ গৃহস্থ ঘরের এবং একটি বিলাসিনী ঘরের পরিচয় কাছে থেকেই পেয়েছি। তার কিছু কিছু বর্ণনা চিঠিগুলির মধ্যে আছে।

কয়েকটি চিঠিতে তখনকার দিনের ইঙ্গবঙ্গের বিবরণ কিছু বিস্তারিত করেই দিয়েছি। আজ এরা লুপ্ত জীব। কোথাও কোথাও তার বর্ত্তমান অভিব্যক্তির কিছু কিছু চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়, এমন কি যাঁরা বিলেতে যান নি তাঁদেরও কারো কারো চালেচলনে ইঙ্গবঙ্গী লক্ষণ অকস্মাৎ ফুটে ওঠে। সেকালের ইঙ্গবঙ্গদের অনেককে আমি প্রত্যক্ষ জানতুম। তাঁদের অনেকখানি পরিচয় পেয়েছি তাঁদের নিজেরই মুখ

থেকে। যদি এর মধ্যে কোনো অত্যুক্তি থাকে সে তাঁদেরই স্বকৃত। আমার সামনে বর্ণনায় নিজেদেরও বেআব্রু করতে ভয় পাননি, যেহেতু মুখচোরা ভালোমানুষ বালকটিকে তাঁরা বিপদজনক ব'লে সন্দেহ করেন নি। আজ তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলে আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। তাঁরা আছেন বৈতরণীর পরপারে।

আমার বিলাতের চিঠিতে "এবার মলে সাহেব হব" গানটি উদ্ধৃত করেছিলেম। আমার স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের দৃষ্টান্তস্বরূপ ঐ গানটি আমার রচনা ব'লে প্রচার করেছেন। তাতে অনামা রচয়িতার মান বেঁচে গেছে, কিন্তু আমার বাঁচেনি। আমার বিশ্বাস যথোচিত গবেষণা করলে আমার লেখা থেকে ওর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতেও পারে।

এই পত্রগুলি যখন লেখা হয়েছিল তার বারো বছর পরে আর একবার বিলেতে গিয়েছিলেম। তখনো দেশের বদল খুব বেশি হয়নি। সেদিন যে ডায়ারি লিখেছি তাতে আছে আঁচড়কাটা ছবি—একাগাড়িতে চলতে চলতে আশেপাশে এক নজরে দেখার দৃশ্য।

বইগুলির পুনঃ সংস্করণের মুখবন্ধে এই চিঠিখানি আপনাকে সম্বোধন ক'রে লিখছি। তার কারণ, বিলেত সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা অনেক প্রশস্ত ও গভীর—সেই ভূমিকার উপর রেখে এই চিঠিগুলি ও ডায়ারির যথাযোগ্য স্থান নির্ণয় করতে পারবেন এবং ভুল ত্রুটি ও অতিভাষণের অপরিহার্য্যতা অনুমান ক'রে ক্ষমা করাও আপনার পক্ষে কঠিন হবে না। ইতি ২৯ আগষ্ট, ১৯৩৬।

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদন

"পাশ্চাত্য-ভ্রমণে" দুই সময়ের লেখা য়ুরোপের দুইটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত রহিল।

ইহার গোড়াতে আছে, চলিত ভাষায় কবির আদিতম গদ্য-রচনা "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র,"—গ্রন্থাকারে যার প্রথম প্রকাশ ১২৮৮ সালে। সে আজ প্রায় চুয়ান্ন বৎসর পূর্ব্বের কথা।

"য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি" প্রথম প্রকাশের সময় দুইটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। ১২৯৮ সালের বৈশাখে ভূমিকাস্বরূপে ইহার প্রথম খণ্ড এবং ১৩০০ সালের ৮ই আশ্বিন যাত্রা-বিবরণ লইয়া দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। স্বতন্ত্র গ্রন্থহিসাবে পরে আর ইহাদের প্রকাশ ঘটে নাই। শুধু দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৩১৪ সালে আর একবার "বিচিত্র প্রবন্ধ" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। "বিচিত্র প্রবন্ধের" আধুনিক সংস্করণে (১৩৪২, চৈত্র) তাহাও বাদ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডটিই এই গ্রন্থে রক্ষিত হইল। ইতি আশ্বিন, ১৩৪৩।

প্রকাশক

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

উপহার

ভাই জ্যোতিদাদা,

ইংলণ্ডে যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত, তাঁহারই হস্তে এই পুস্তকটি সমর্পণ করিলাম।

স্নেহভাজন

রবি।

পাশ্চাত্য ভ্রমণ

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

প্রথম পত্র

বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা "পুনা" ষ্টীমারে উঠলেম। পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিলে। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল। চারিদিকের লোকের কোলাহল সইতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। গোপন করবার বিশেষ প্রয়োজন দেখছিনে, আমার মনটা কেমন নির্জ্জীব, অবসন্ন, ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু দূর হোকগে—ওসব করুণ রসাত্মক কথা লেখবার অবসরও নেই ইচ্ছেও নেই ; আর লিখলেও, হয় তোমার চোখের জল থাকবে না, নয় তোমার ধৈর্য্য থাকবে না।

সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ! ২০শে থেকে ২৬শে পর্য্যন্ত যে ক'রে কাটিয়েছি তা আমিই জানি! "সমুদ্র পীড়া" কা'কে বলে অবিশ্যি জানো, কিন্তু কী রকম তা জানো না। আমি সেই ব্যামোয় পড়েছিলেম,

সে কথা বিস্তারিত ক'রে লিখলে পাষাণেরও চোখে জল আসবে! ৬টা দিন, মশায়, শয্যা থেকে উঠিনি। যে ঘরে থাকতেম, সেটা অতি অন্ধকার, ছোটো; পাছে সমুদ্রের জল ভিতরে আসে তাই চারদিকের জানলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। অসূর্য্যম্পশ্যরূপ ও অবায়ুস্পর্শ দেহ হয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম মাত্র। প্রথম দিন সন্ধ্যেবেলায় আমাদের একজন সহযাত্রী আমাকে জোর ক'রে বিছানা থেকে উঠিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে গেলেন। যখন উঠে দাঁড়ালেম তখন আমার মাথার ভিতর যা-কিছু আছে সবাই মিলে যেন মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ ক'রে দিলে, চোখে দেখতে পাইনে, পা চলে না, সর্ব্বাঙ্গ টলমল করে! দু পা গিয়েই একটা বেঞ্চিতে গিয়ে ব'সে পড়লেম। আমার সহযাত্রীটি আমাকে ধরাধরি ক'রে জাহাজের ডেক-এ নিয়ে গেলেন। একটা রেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেম। তখন অন্ধকার রাত। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। আমাদের প্রতিকূলে বাতাস বইছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে—সেই নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্রে দুই দিকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত করতে করতে আমাদের জাহাজ একলা চলেছে, যেখানে চাই সেইদিকেই অন্ধকার, সমুদ্র ফুলে' ফুলে' উঠছে—সে এক মহা গম্ভীর দৃশ্য!

সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেম না। মাথা ঘুরতে লাগল। ধরা-ধরি ক'রে আবার আমার ক্যাবিনে এলেম। সেই-যে বিছানায় পড়লেম, ছ দিন আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও মাথা তুলিনি। আমাদের যে ষ্টুয়র্ড ছিল, (যাত্রীদের সেবক)—কারণ জানিনে—আমার উপর তার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। দিনের মধ্যে যখন-তখন সে আমার জন্যে খাবার নিয়ে উপস্থিত করত; না খেলে কোনো মতেই ছাড়ত না। সে বলত, না খেলে আমি ইঁদুরের মতো দুর্ব্বল হয়ে পড়ব (weak as a rat)। সে বলত সে আমার জন্যে সব কাজ করতে পারে। আমি তাকে যথেষ্ট

সাধুবাদ দিতেম, এবং জাহাজ ছেড়ে আসবার সময় সাধুবাদের চেয়ে আরো কিঞ্চিৎ সারবান পদার্থ দিয়েছিলেম।

ছ দিনের পর আমরা যখন এডেনের কাছাকাছি পৌঁছলেম, তখন সমুদ্র কিছু শান্ত হোলো। সেদিন আমার ষ্টুয়র্ড এসে ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়াবার জন্যে আমাকে বারবার অনুরোধ করতে লাগল। আমি তার পরামর্শ শুনে বিছানা থেকে তো উঠলেম, উঠে দেখি যে সত্যিই ইঁদুরের মতো দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। মাথাটা যেন ধার-করা, কাঁধের সঙ্গে তা'র ভালো রকম বনে না; চুরি-করা কাপড়ের মতো শরীরটা যেন আমার ঠিক গায়ে লাগছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতের উপর গিয়ে একটা কেদারায় হেলান দিয়ে পড়লেম। অনেক দিনের পর বাতাস পেয়ে বাঁচলেম। দুপুর বেলা দেখি একটা ছোটো নৌকো সেই সমুদ্র দিয়ে চলেছে। চারদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত আর ডাঙা নেই, জাহাজসুদ্ধ লোক অবাক। তারা আমাদের ষ্টীমারকে ডাকতে আরম্ভ করলে; জাহাজ থামল। তারা একটি ছোটো নৌকায় ক'রে কতকগুলি লোক জাহাজে পাঠিয়ে দিলে। এরা সকলে আরব দেশীয়, এডেন থেকে মস্কটে যাচ্চে। পথের মধ্যে দিকভ্রম হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে যা জলের পিপে ছিল, তা ভেঙে গিয়ে জল সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে; অথচ যাত্রী অনেক। আমাদের জাহাজের লোকেরা তাদের জল দিলে। একটি ম্যাপ খুলে কোন দিকে ও কতদূরে মস্কট, তাদের দেখিয়ে দিলে; তারা আবার চলতে লাগল। সে নৌকো যে মস্কট পর্য্যন্ত পৌঁছবে, তাতে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল।

২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের সম্মুখে সব পাহাড় পর্ব্বত উঠেছে। অতি সুন্দর পরিষ্কার প্রভাত; সূর্য্য সবেমাত্র উঠেছে, সমুদ্র অতিশয় শান্ত। দূর থেকে সেই পর্ব্বতময়

ভূভাগের প্রভাতদৃশ্য এমন সুন্দর দেখাচ্চে যে কী বলব। পর্ব্বতের উপর রঙিন মেঘগুলি এমন নত হয়ে পড়েছে, যে মনে হয় যেন, অপরিমিত সূর্য্যকিরণ পান ক'রে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্ব্বতের উপরে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আয়নার মতো পরিষ্কার শান্ত সমুদ্রের উপর ছোটো ছোটো পাল-তোলা নৌকাগুলি আবার কেমন ছবির মতো দেখাচ্চে।

এডেনে পৌঁছে বাড়িতে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেম কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি যে এই ক-দিন নাড়াচাড়া খেয়ে মাথার ভিতরে যেন সব উল্‌টো পাল্‌টা হয়ে গেছে, বুদ্ধির রাজ্যে একটা অরাজকতা ঘটেছে; কী ক'রে লিখব, ভালো মনে আসছে না। ভাবগুলো যেন মাকড়ষার জালের মতো, ছুঁতে গেলেই অমনি ছিঁড়ে খুঁড়ে যাচ্চে। কিসের পর কী লিখব, তার একটা ভালো রকম বন্দোবস্ত করতে পারছিনে। এই অবস্থায় লিখতে আরম্ভ করলেম, এমন বিপদে প'ড়ে তোমাকে যে লিখতে পারিনি তাতে তোমার ক্ষোভের কারণ কিছুই নেই।

দেখো, সমুদ্রের উপর আমার কতকটা অশ্রদ্ধা হয়েছে। কল্পনায় সমুদ্রকে যা মনে করতেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলে না। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান ব'লে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা হয় না। তার কারণ আছে; আমি যখন বম্বের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতেম তখন দেখতেম, দূর দিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে, কল্পনায় মনে করতেম যে, একবার যদি ঐ দিগন্তের আবরণ ভেদ করতে পারি—ঐ দিগন্তের যবনিকা ওঠাতে পারি, অমনি আমার সুমুখে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথলে উঠবে। ঐ দিগন্তের পর যে কী আছে তা আমার কল্পনাতেই থাকত; তখন মনে হোত না, ঐ দিগন্তের পরে আর এক

দিগন্ত আসবে। কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি, তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চলছে না, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সঙ্কীর্ণ যে কেমন তৃপ্তি হয় না। কিন্তু দেখো, একথা বড়ো গোপনে রাখা উচিত; বাল্মীকি থেকে বায়রণ পর্য্যন্ত সকলেরই যদি এই সমুদ্র দেখে ভাব লেগে থাকে, তবে আমার না লাগলে দশজনে হেসে উঠবে; গ্যালিলিওর সময়ে একথা বললে হয়তো আমাকে কয়েদ যেতে হোত। এত কবি সমুদ্রের স্তুতিবাদ করেছেন যে আজ আমার এই নিন্দায় তাঁর বোধ হয় বড়ো একটা গায়ে লাগবে না। যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন বোধ করি সমুদ্র বেশ দেখায়, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদ্রের তরঙ্গ উঠলেই আমার এমন মাথা ঘুরতে থাকে যে আমার দেখাশুনো সব ঘুরে যায়।

আমি যখন ঘর থেকে বেরোতে আরম্ভ করলেম, তখন জাহাজের যাত্রীদের উপর আমার নজর পড়ল ও আমার উপর জাহাজের যাত্রীদের নজর পড়ল। আমি স্বভাবতই "লেডি"-জাতিকে বড়ো ডরাই। তাঁদের কাছে ঘেঁসতে গেলে এত প্রকার বিপদের সম্ভাবনা যে, চাণক্য পণ্ডিত থাকলে "লেডি"-দের কাছ থেকে দশ সহস্র হস্ত দূরে থাকতে পরামর্শ দিতেন। এক তো, মনোরাজ্যে নানাপ্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা—তাছাড়া সর্ব্বদাই ভয় হয় পাছে কী কথা বলতে কী কথা ব'লে ফেলি, আর আমাদের অসহিষ্ণু লেডি তাঁদের আদব-কায়দার তিলমাত্র ব্যতিক্রম সইতে না পেরে দারুণ ঘৃণায় ও লজ্জায় একেবারে অভিভূত হন। পাছে তাঁদের গাউনের অরণ্যের মধ্যে ভেবাচেকা খেয়ে যাই, পাছে আহারের সময় তাঁদের মাংস কেটে দিতে হয়, পাছে মুরগীর মাংস কাটতে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে বসি,—এই রকম

সাত পাঁচ ভেবে আমি জাহাজের লেডিদের কাছ থেকে অতি দূরে থাকতেম। আমাদের জাহাজে লেডির অভাব ছিল না, কিন্তু জেণ্টেলম্যানেরা সর্ব্বদা খুঁৎ খুঁৎ করতেন যে, তাদের মধ্যে অল্পবয়স্কা বা সুশ্রী একজনও ছিল না।

পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোলো। ব—মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁর কথা অনর্গল, হাসি অজস্র, আহার অপরিমিত। সকলের সঙ্গেই তাঁর আলাপ, সকলের সঙ্গেই তিনি হাসি-তামাসা ক'রে বেড়ান। তাঁর একটা গুণ আছে, তিনি কখনো বিবেচনা ক'রে, মেজে ঘ'ষে কথা কন না; ঠাট্টা করেন, সকল সময়ে তার মানে না থাকুক, তিনি নিজে হেসে আকুল হন। তিনি তাঁর বয়সের ও পদমানের গাম্ভীর্য্য বুঝে হিসাব ক'রে কথা কন না, মেপে জুকে হাসেন না ও দুদিক বজায় রেখে মত প্রকাশ করেন না, এই সকল কারণে তাঁকে আমার ভালো লাগত। কত প্রকার যে ছেলেমানুষী করেন তার ঠিক নেই। বৃদ্ধত্বের বুদ্ধি ও বালকত্বের সাদাসিদা নিশ্চিন্ত ভাব একত্রে দেখ্‌লে আমার বড়ো ভালো লাগে। আমাকে তিনি "অবতার" বল্‌তেন, Gregory সাহেবকে "গড্‌গড়ি" বল্‌তেন, জাহাজের আর এক যাত্রীকে "রুহিমৎস্য" ব'লে ডাক্‌তেন; সে বেচারীর অপরাধ কী তা জানো? সাধারণ মানুষদের চেয়ে তার ঘাড়ের দিকটা কিছু খাটো ছিল, তার মাথা ও শরীরের মধ্যে একটা যোজক পদার্থ ছিল না বললেও হয়। এই জন্যে ব—মহাশয় তাকে মৎস্য শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু আমি যে কেন অবতার শ্রেণীর মধ্যে প'ড়ে গিয়েছিলেম, তার কারণ সহজে নির্দ্দেশ করা যায় না।

আমাদের জাহাজের T—মহাশয় কিছু নূতন রকমের লোক। তিনি ঘোরতর ফিলজফর মানুষ। তাঁকে কখনো চলিত ভাষায় কথা কইতে

শুনিনি। তিনি কথা কইতেন না, বক্তৃতা দিতেন। এক দিন আমরা দু চারজনে মিলে জাহাজের ছাতে দুদণ্ড আমোদ প্রমোদ করছিলেম, এমন সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে ব—মহাশয় তাঁকে বললেন "কেমন সুন্দর তারা উঠেছে," এই আমাদের ফিলজফর তারার সঙ্গে মনুষ্য জীবনের সঙ্গে একটা গভীর সম্বন্ধ বাধিয়ে দিয়ে বক্তৃতা সুরু করলেন—আমরা "মুখেতে চাহিয়া থাকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া" রইলেম।

আমাদের জাহাজে একটি আস্ত জনবুল্ ছিলেন। তাঁর তাল-বৃক্ষের মতো শরীর, ঝাঁটার মতো গোঁফ, সজারুর কাঁটার মতো চুল, হাঁড়ির মতো মুখ, মাছের চোখের মতো ম্যাড়মেড়ে চোখ, তাঁকে দেখলেই আমার গা কেমন কর্‌ত, আমি পাঁচ হাত তফাতে স'রে যেতেম। এক-এক জন কোনো অপরাধ না করলেও তার মুখশ্রী যেন সর্ব্বদা অপরাধ করতে থাকে। প্রত্যহ সকালে উঠেই শুনতে পেতেম তিনি ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি যত ভাষা জানেন সমস্ত ভাষায় জাহাজের সমস্ত চাকর-বাকরদের অজস্র গাল দিতে আরম্ভ করেছেন, ও দশদিকে দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্চেন। তাঁকে কখনো হাসতে দেখি নি; কারো সঙ্গে কথা নেই বার্ত্তা নেই, আপনার ক্যাবিনে গোঁ হয়ে ব'সে আছেন। কোনো কোনো দিন "ডেক্-এ" বেড়াতে আসতেন, বেড়াতে বেড়াতে যার দিকে একবার কৃপা-কটাক্ষে নেত্রপাত করতেন, তাকে যেন পিঁপড়াটির মতো মনে করতেন।

প্রত্যহ খাবার সময়ে ঠিক আমার পাশেই B—বসতেন। তিনি একটি ইয়ুরাসীয়। কিন্তু তিনি ইংরেজের মতো শিষ দিতে, পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক ক'রে দাঁড়াতে সম্পূর্ণরূপে শিখেছেন। তিনি আমাকে অনুগ্রহের চোখে দেখতেন। এক দিন এসে মহাগম্ভীর স্বরে বললেন—"Young man, তুমি Oxford-এ যাচ্চ? Oxford

University বড়ো ভালো বিদ্যালয়।" আমি এক দিন ট্রেঞ্চ সাহেবের "Proverbs and their lessons" বই খানি পড়ছিলেম, তিনি এসে বইটি নিয়ে শিষ দিতে দিতে দুচার পাত উলটিয়ে পালটিয়ে বললেন "হাঁ, ভালো বই বটে!"

এডেন থেকে সুয়েজে যেতে দিন পাঁচেক লেগেছিল। যারা ব্রিন্দিশি-পথ দিয়ে ইংলণ্ডে যায় তাদের জাহাজ থেকে নেবে সুয়েজে রেলওয়ের গাড়িতে উঠে আলেকজান্দ্রিয়াতে যেতে হয়; আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে তাদের জন্যে একটা ষ্টীমার অপেক্ষা করে—সেই ষ্টীমারে চ'ড়ে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইটালিতে পৌঁছতে হয়। আমরা Overland ডাঙা-পেরোনো যাত্রী, সুতরাং আমাদের সুয়েজে নাবতে হোলো। আমরা তিন জন বাঙালি ও একজন ইংরেজ একখানি আরব নৌকো ভাড়া করলেম। মানুষের "divine" মুখশ্রী কতদূর পশুত্বের দিকে নাবতে পারে, তা সেই নৌকোর মাঝিটার মুখ দেখলে জানতে পারতে। তার চোখ দুটো যেন বাঘের মতো, কালো কুচকুচে রং, কপাল নিচু, ঠোঁট পুরু, সবসুদ্ধ মুখের ভাব অতি ভয়ানক। অন্যান্য নৌকার সঙ্গে দরে বনলো না, সে একটু কম দামে নিয়ে যেতে রাজি হোলো। ব—মহাশয় তো সে নৌকোয় বড়ো সহজে যেতে রাজি নন; তিনি বললেন আরবদের বিশ্বাস করতে নেই—ওরা অনায়াসে গলায় ছুরি দিতে পারে। তিনি সুয়েজের দুই একটা ভয়ানক ভয়ানক অরাজকতার গল্প করলেন। কিন্তু যা হোক, আমরা সেই নৌকোয় তো উঠলেম। মাঝিরা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি কয়, ও অল্প-স্বল্প ইংরেজি বুঝতে পারে। আমরা তো কতক দূর নির্ব্বিবাদে গেলেম। আমাদের ইংরেজ-যাত্রীটির সুয়েজের পোষ্ট-আফিসে নাববার দরকার ছিল। পোষ্ট-আফিস অনেক দূর, এবং যেতে অনেক বিলম্ব হবে, তাই মাঝি একটু আপত্তি করলে; কিন্তু শীঘ্রই সে আপত্তি ভঞ্জন হোলো। তার পরে আবার কিছু

দূরে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে "পোষ্ট-আফিসে যেতে হবে কি? সে দুই এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া অসম্ভব।"—আমাদের রুক্ষ স্বভাব সাহেবটি মহা ক্ষাপা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "Your grand mother"। এই তো আমাদের মাঝি রুখে উঠলেন, "What? mother? mother? what mother, don't say mother"। আমরা মনে করলুম সাহেবটাকে ধরে বুঝি জলে ফেলে দিলে, আবার জিজ্ঞাসা করলে "What did say? (অর্থাৎ কী বললি?)" সাহেব তাঁর রোখ ছাড়লেন না। আবার বললেন "Your grand mother"। এই তো আর রক্ষা নেই, মাঝিটা মহা তেড়ে উঠল। সাহেব গতিক ভালো নয় দেখে নরম হয়ে বললেন "You don't seem to understand what I say!" অর্থাৎ তিনি তখন grandmother বলাটা যে গালি নয় তাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত। তখন সে মাঝিটা ইংরেজি ভাষা ছেড়ে ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল "বস্—চুপ!" সাহেব থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, আর তাঁর বাক্য স্ফূর্ত্তি হোলো না। আবার খানিক দূর গিয়ে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন "কতদূর বাকি আছে?" মাঝি অগ্নি-শর্ম্মা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল "Two shillings give, ask what distance"! আমরা এই রকম বুঝে গেলেম যে, দুশিলিং ভাড়া দিলে সুয়েজ রাজ্যে এই রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আইনে নেই! মাঝিটা যখন আমাদের এই রকম ধমক দিচ্চে, তখন অন্য অন্য দাঁড়িদের ভারি আমোদ বোধ হচ্চে, তারা তো পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে মুচকি মুচকি হাসি আরম্ভ করলে। মাঝি মহাশয়ের বিষম বদমেজাজ দেখে তাদের হাসি সামলানো দায় হয়ে উঠেছিল। এক দিকে মাঝি ধমকাচ্চে, এক দিকে দাঁড়িগুলো হাসি জুড়ে দিয়েছে, মাঝিটার উপর প্রতিহিংসা তোলবার আর কোনো উপায় না দেখে আমরাও তিনজনে মিলে হাসি

জুড়ে দিলেম—এরকম সুবুদ্ধি অনেক স্থলে দায়ে পড়ে খাটাতে হয়। মানে মানে সুয়েজ সহরে গিয়ে তো পৌঁছলেম। সুয়েজ সহর সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার অধিকার নাই, কারণ আমি সুয়েজের আধ মাইল জায়গার বেশি আর দেখিনি। সহরের চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ করবার বাসনা ছিল, কিন্তু আমার সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা পূর্ব্বে সুয়েজ দেখেছিলেন, তাঁরা বললেন,"এ পরিশ্রমে শ্রান্তি ও বিরক্তি ছাড়া অন্য কোনো ফললাভের সম্ভাবনা নেই।" তাতেও আমি নিরুৎসাহ হইনি কিন্তু শুনলেম গাধায় চ'ড়ে বেড়ানো ছাড়া সহরে বেড়াবার আর কোনো উপায় নেই। শুনে সহরে বেড়াবার দিকে টান আমার অনেকটা কমে গেল, তারপরে শোনা গেল, এদেশের গাধাদের সঙ্গে চালকদের সকল সময়ে মতের ঐক্য হয় না, তারো একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছে আছে ; এই জন্যে সময়ে সময়ে দুই ইচ্ছের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রায় দেখা যায়, গাধার ইচ্ছে পরিণামে জয়ী হয়। সুয়েজে একপ্রকার জঘন্য চোখের ব্যামোর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব—রাস্তায় অমন শত শত লোকের চোখ ঐরকম রোগগ্রস্ত দেখতে পাবে। এখানকার মাছিরা ঐ রোগ চারদিকে বিতরণ করে বেড়ায়। রোগগ্রস্ত চোখ থেকে ঐ রোগের বীজ আহরণ ক'রে তারা অরুগ্ন চোখে গিয়ে বসে, চারদিকে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সুয়েজে আমরা রেল গাড়িতে উঠলেম। এ রেলগাড়ির অনেক প্রকার রোগ আছে, প্রথমতঃ শোবার কোনো বন্দোবস্ত নেই, কেননা, বসবার জায়গাগুলি অংশে অংশে বিভক্ত, দ্বিতীয়তঃ এমন গজগামিনী রেলগাড়ি সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায় না। সমস্ত রাত্রিই গাড়ি চলেছে, দিনের বেলা যখন জেগে উঠলেম তখন দেখলেম ধূলোয় আমাদের কেবল গোর হয়নি, আর সব হয়েছে। চুলে হাত দিতে গিয়ে দেখি, চুলে এমন এক স্তর মাটি জমেছে যে, মাথায় অনায়াসে ধান চাষ করা যায়। এই রকম ধূলোমাখা

সন্ন্যাসীর বেশে আমরা আলেকজান্দ্রিয়াতে গিয়ে পৌঁছলেম। রেলের লাইনের দুধারে সবুজ শস্যক্ষেত্র। জায়গায় জায়গায় খেজুরের গাছে থোলো থোলো খেজুর ফ'লে রয়েছে। মাঠের মাঝে মাঝে কুণ্ড। মাঝে মাঝে দুই একটা কোঠা বাড়ি—বাড়িগুলো চৌকোণা, থাম নেই, বারান্দা নেই—সমস্তটাই দেয়ালের মতো, সেই দেয়ালের মধ্যে মধ্যে দুই একটা জানালা। এইসকল কারণে বাড়িগুলোর যেন শ্রী নেই। যাহোক আমি আগে আফ্রিকার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যে রকম অনুর্ব্বর মরুভূমি মনে করে রেখেছিলুম, চারদিক দেখে তা কিছুই মনে হোলো না। বরং চারিদিককার সেই হরিৎ ক্ষেত্রের উপর খেজুরকুঞ্জের মধ্যে প্রভাতটি আমার অতি চমৎকার লেগেছিল।

আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে আমাদের জন্য "মঙ্গোলিয়া" ষ্টীমার অপেক্ষা করছিল। এইবার আমরা ভূমধ্যসাগরের বক্ষে আরোহণ করলেম। আমার একটু শীত-শীত করতে লাগল। জাহাজে গিয়ে খুব ভাল করে স্নান করলেম, আমার তো হাড়ে হাড়ে ধূলো প্রবেশ করেছিল। স্নান করার পর আলেকজান্দ্রিয়া সহর দেখতে গেলেম। জাহাজ থেকে ডাঙা পর্য্যন্ত যাবার জন্যে একটা নৌকো ভাড়া হোলো। এখানকার এক-একটা মাঝি সার উইলিয়ম জোন্সের দ্বিতীয় সংস্করণ বললেই হয়। তারা গ্রীক, ইটালিয়ন, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি প্রভৃতি অনেক ভাষায় চলনসই রকম কথা কইতে পারে। শুনলেম ফ্রেঞ্চ ভাষাই এখানকার সাধারণ ভাষা, রাস্তাঘাটের নাম, সাইনবোর্ডে দোকানগুলির আত্মপরিচয়, অধিকাংশই ফরাসী ভাষায় লেখা। আলেকজান্দ্রিয়া সহরটি সমৃদ্ধিশালী মনে হোলো। এখানে যে কত জাতের লোক ও কত জাতের দোকান বাজার আছে তার ঠিকানা নেই। রাস্তাগুলি পাথর দিয়ে বাঁধানো, তাতে বেশ পরিষ্কার থাকে, কিন্তু গাড়ির শব্দ বড়ো বেশিরকম

হয়। খুব বড়ো বড়ো বাড়ি—বড়ো বড়ো দোকান, সহরটি খুব জমকালো বটে। আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দর খুব প্রকাণ্ড। বিস্তর জাহাজ এখানে আশ্রয় পায়। য়ুরোপীয়, মুসলমান সকলপ্রকার জাতিরই জাহাজ এ বন্দরে আছে, কেবল হিন্দুদের জাহাজ নেই।

চার পাঁচ দিনে আমরা ইটালীতে গিয়ে পৌছলেম। তখন রাত্রি একটা দুটো হবে। গরম বিছানা ত্যাগ ক'রে, জিনিষপত্র নিয়ে আমরা জাহাজের ছাতে গিয়ে উঠ্‌লেম। জ্যোৎস্নারাত্রি, খুব শীত; আমার গায়ে বড়ো একটা গরম কাপড় ছিল না, তাই ভারি শীত করছিল। আমাদের সম্মুখে নিস্তব্ধ সহর, বাড়িগুলির জানালা দরজা সমস্ত বন্ধ—সমস্ত নিদ্রামগ্ন। আমাদের যাত্রীদের মধ্যে ভারি গোল পড়ে গেল, কখনো শুনি, ট্রেণ পাওয়া যাবে, কখনো শুনি পাওয়া যাবে না। জিনিষ-পত্রগুলো নিয়ে কী করা যাবে ভেবে পাওয়া যায় না, জাহাজে থাকব কি বেরোব কিছুই স্থির নেই। একজন Italian Officer এসে আমাদের গুণতে আরম্ভ করলে—কিন্তু কেন গুণতে আরম্ভ করলে তা ভেবে পাওয়া গেল না। জাহাজের মধ্যে এই রকম একটা অস্ফুট জনশ্রুতি প্রচারিত হোলো যে, এই গণনার সঙ্গে আর আমাদের ট্রেণে চড়ার একটা বিশেষ যোগ আছে। কিন্তু সে রাত্রে মূলেই ট্রেণ পাওয়া গেল না। শোনা গেল, তার পরদিন বেলা তিনটের আগে ট্রেণ পাওয়া যাবে না। যাত্রীরা মহা বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। অবশেষে সে রাত্রে ব্রিন্দিসির হোটেলে আশ্রয় নিতে হোলো।

এই তো প্রথম য়ুরোপের মাটিতে আমার পা পড়ল। কোনো নূতন দেশে আস্‌বার আগে আমি তাকে এমন নূতনতর মনে ক'রে রাখি যে, এসে আর তা নূতন ব'লে মনেই হয় না। য়ুরোপ আমার তেমন নূতন মনে হয়নি শুনে সকলেই অবাক্!

আমরা রাত্রি তিনটের সময় ব্রিন্দিসির হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। সকালে একটা আধ-মরা ঘোড়া ও আধ-ভাঙা গাড়ি চ'ড়ে সহর দেখ্‌তে বের হলেম। সারথির সঙ্গে গাড়িঘোড়ার এমন অসামঞ্জস্য, যে কী বল্‌ব! সারথির বয়স চোদ্দো হবে—কিন্তু ঘোড়াটির বয়স পঞ্চাশ হবে—আর গাড়িটি পৌরাণিক যুগের মনে হোলো। ছোটোখাটো সহর যেমন হয়ে থাকে ব্রিন্দিসিও তাই। কতকগুলি কোঠাবাড়ি, দোকানবাজার, রাস্তাঘাট আছে। ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা ক'রে ফিরছে, দুচারজন লোক মদের দোকানে বসে গল্পগুজব করছে—দুচারজন রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে হাসিতামাসা করছে; লোকজনেরা অতি নিশ্চিন্তমুখে গজেন্দ্রগমনে গমন করছে; যেন কারো কোনো কাজ নেই, কারো কোনো ভাবনা নেই—যেন সহরসুদ্ধ ছুটি। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার সমারোহ নেই, লোকজনের সমাগম নেই। আমরা খানিকদূর যেতেই একজন ছোকরা আমাদের গাড়ি থামিয়ে হাতে একটা তরমুজ নিয়ে গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বসল। ব—মহাশয় বল্‌লেন, "বিনা আয়াসে এঁর কিছু রোজগার কর্‌বার বাসনা আছে"; লোকটা এসে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে মাঝে মাঝে আমাদের দেখিয়ে দিতে লাগ্‌ল, "ঐটে চর্চ্চ, ঐটে বাগান, ঐটে মাঠ" ইত্যাদি। তার টীকাতে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানবৃদ্ধি হয়নি, আর, তার টীকা না হোলেও আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানের ব্যাঘাত হোত না। তাকে কেউ আমাদের গাড়িতে উঠ্‌তে বলেনি, কেউ তাঁকে কোনো বিষয় জিজ্ঞাসাও করেনি, কিন্তু তবু এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্যে তার যাচ্ঞা পূর্ণ কর্‌তে হোলো। তারা আমাদের একটা ফলের বাগানে নিয়ে গেল। সেখানে যে কতপ্রকার ফলের গাছ, তার সংখ্যা নেই। চারিদিকে থোলো থোলো আঙুর ফ'লে রয়েছে। দুরকম আঙুর আছে—কালো আর সাদা। তার মধ্যে কালোগুলিই আমার বেশি মিষ্টি লাগ্‌ল। বড়ো

বড়ো গাছে আপেল, পিচ প্রভৃতি অনেকপ্রকার ফল ধরে আছে। একজন বুড়ি (বোধ হয় উদ্যান-পালিকা) কতকগুলি ফলফুল নিয়ে উপস্থিত কর্‌লে। আমরা সেদিকে নজর কর্‌লেম না; কিন্তু ফল বিক্রয় কর্‌বার উপায় সে বিলক্ষণ জানে। আমরা ইতস্ততঃ বেড়াচ্চি, এমন সময়ে দেখি একটি সুন্দরী মেয়ে কতকগুলি ফল আর ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের সম্মুখে হাজির হোলো, তখন আর অগ্রাহ্য কর্‌বার সাধ্য রইল না।

ইটালির মেয়েদের বড়ো সুন্দর দেখতে। অনেকটা আমাদের দেশের মেয়ের ভাব আছে। সুন্দর রং, কালো কালো চুল, কালো ভুরু, কালো চোখ, আর মুখের গড়ন চমৎকার।

তিনটের ট্রেণে ব্রিন্দিশি ছাড়লেম। রেলোয়ে পথের দুধারে আঙুরের ক্ষেত, চমৎকার দেখতে। পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, কুটীর, শস্য ক্ষেত্র, ছোটো-ছোটো গ্রাম প্রভৃতি যত কিছু কবির স্বপ্নের ধন, সমস্ত চারদিকে শোভা পাচ্চে। গাছপালার মধ্যে থেকে যখন কোনো একটি দূরস্থ নগর, তার প্রাসাদচূড়া, তার চর্চ্চের শিখর, তার ছবির মতো বাড়িগুলি আস্তে আস্তে চোখে পড়ে তখন বড়ো ভালো লাগে। সন্ধ্যে বেলায় একটি পাহাড়ের নিচে অতি সুন্দর একটি হ্রদ দেখেছিলেম, তা আমি ভুলতে পারব না, তার চারিদিকে গাছপালা, জলে সন্ধ্যার ছায়া সে অতি সুন্দর, তা আমি বর্ণনা করতে চাইনে।

রেলোয়ে ক'রে যেতে যেতে আমরা Mont Cenis-এর বিখ্যাত সুরঙ্গ দেখলেম। এই পর্ব্বতের এ পাশ থেকে ফরাসীরা ও-পাশ থেকে ইটালিয়নরা, এক সঙ্গে খুদতে আরম্ভ করে, কয়েক বৎসর খুদতে খুদতে দুই যন্ত্রীদল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সমুখা-সমুখী হয়। এই গুহা অতিক্রম করতে রেলগাড়ির ঠিক আধ ঘণ্টা লাগল। সে

অন্ধকারে আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠছিলেম। এখনকার রেলগাড়ির মধ্যে দিনরাত আলো জ্বালাই আছে, কেননা, এক-এক স্থানে প্রায় পাঁচমিনিট অন্তর এক একটা পর্ব্বতগুহা ভেদ করতে হয়—সুতরাং দিনের আলো খুব অল্পক্ষণ পাওয়া যায়। ইটালী থেকে ফ্রান্স পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা—নির্ঝর, নদী, পর্ব্বত, গ্রাম, হ্রদ, দেখতে দেখতে আমরা পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলেম।

সকাল বেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌছলেম। কী জমকালো সহর! অভ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। মনে হয় প্যারিসে বুঝি গরীব লোক নেই। মনে হোলো, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্য এমন প্রকাণ্ড জমকালো বাড়িগুলোর কী আবশ্যক। হোটেলে গেলেম, এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড, যে, ঢিলে কাপড় প'রে যেমন সোয়াস্তি হয় না, সে হোটেলেও বোধ করি তেমনি অসোয়াস্তি হয়। স্মরণস্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জন-কোলাহল প্রভৃতিতে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্যারিসে পৌছিয়েই আমরা একটা "টর্কিষ-বাথে" গেলেম। প্রথমতঃ একটা খুব গরম ঘরে গিয়ে বসলেম, সে ঘরে অনেকক্ষণ থাকতে থাকতে কারো কারো ঘাম বেরতে লাগল, কিন্তু আমার তো বেরল না, আমাকে তার চেয়ে আর একটা গরম ঘরে নিয়ে গেল, সে ঘরটা আগুনের মতো, চোখ মেলে থাকলে চোখ জ্বালা করতে থাকে, মিনিট কতক থেকে সেখানে আর থাকতে পারলেম না, সেখানে থেকে বেরিয়ে খুব ঘাম হোতে লাগল। তার পরে একজায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাকে শুইয়ে দিলে। ভীমকায় এক ব্যক্তি এসে আমার সর্ব্বাঙ্গ ডলতে লাগল। তার সর্ব্বাঙ্গ খোলা, এমন মাংসপেশল চমৎকার শরীর কখনো দেখিনি। "বৃঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।" মনে মনে ভাবলেম ক্ষীণকায় এই মশকটিকে

দলন করার জন্যে এমন প্রকাণ্ড কামানের কোনো আবশ্যক ছিল না। সে আমাকে দেখে বললে, আমার শরীর বেশ লম্বা আছে,—এখন পাশের দিকে বাড়লে আমি একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হব। আধঘণ্টা ধরে সে আমার সর্ব্বাঙ্গ অবিশ্রান্ত দলন করলে, ভূমিষ্ঠকাল থেকে যত ধূলো মেখেছি, শরীর থেকে সব যেন উঠে গেল। যথেষ্টরূপে দলিত ক'রে আমাকে আর একটি ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে গরম জল দিয়ে, সাবান দিয়ে, স্পঞ্জ দিয়ে শরীরটা বিলক্ষণ ক'রে পরিষ্কার করলে। পরিষ্করণ পর্ব্ব শেষ হোলে আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা বড়ো পিচকিরি ক'রে গায়ে গরম জল ঢালতে লাগল, হঠাৎ গরম জল দেওয়া বন্ধ ক'রে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল বর্ষণ করতে লাগল; এই রকম কখনো গরম কখনো ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে একটা জলযন্ত্রের মধ্যে গেলেম, তার উপর থেকে, নিচে থেকে চার পাশ থেকে, বাণের মতো জল গায়ে বিঁধতে থাকে—সেই বরফের মতো ঠাণ্ডা বরুণ-বাণ-বর্ষণের মধ্যে খানিকক্ষণ থেকে আমার বুকের রক্ত পর্য্যন্ত যেন জমাট হয়ে গেল—রণে ভঙ্গ দিতে হোলো, হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলাম। তার পরে এক জায়গায় পুকুরের মতো আছে, আমি সাঁতার দিতে রাজি আছি কিনা জিজ্ঞাসা করলে,—আমি সাঁতার দিলেম না, আমার সঙ্গী সাঁতার দিলেন; তাঁর সাঁতার দেওয়া দেখে তারা বলাবলি করতে লাগল—"দেখো, দেখো, এরা কি অদ্ভুত রকম ক'রে সাঁতার দেয়, ঠিক কুকুরের মতো।" এতক্ষণে স্নান শেষ হোলো। আমি দেখলেম টর্কিষ-বাথে স্নান করা আর শরীরটাকে ধোপার বাড়ি দেওয়া এক কথা। তারপরে সমস্ত দিনের জন্য এক পাউণ্ড দিয়ে এক গাড়ি ভাড়া করা গেল। প্যারিস এক্‌জিবিষন দেখতে গেলেম। তুমি এইবার হয়তো খুব আগ্রহের সঙ্গে কান খাড়া করেছ, ভাব্‌ছ আমি প্যারিস্ এক্‌জিবিষনের বিষয় কী না জানি বর্ণনা করব। কিন্তু দুঃখের বিষয়

কী বলব, কলকাতার য়ুনিভার্সিটিতে বিদ্যা শেখার মতো প্যারিস এক্‌জিবিষনের সমস্ত দেখেছি কিন্তু কিছুই ভালো ক'রে দেখিনি। একদিনের বেশি আমাদের প্যারিসে থাকা হোলো না—সে বৃহৎ কাণ্ড একদিনে দেখা কারো সাধ্য নয়। সমস্তদিন আমরা দেখলেম—কিন্তু সেরকম দেখায়, দেখবার একটা তৃষ্ণা জন্মাল কিন্তু দেখা হোলো না। সে একটা নগর বিশেষ। একমাস থাকলে তবে তা বর্ণনা করবার দুরাশা করতেম। প্যারিস এক্‌জিবিষনের একটা স্তূপাকার ভাব মনে আছে, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই। সাধারণতঃ মনে আছে যে চিত্রশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য চমৎকার ছবি দেখেছি—স্থাপত্য-শালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি দেখেছি—নানা দেশবিদেশের নানা জিনিষ দেখেছি ; কিন্তু বিশেষ কিছু মনে নেই। তারপর প্যারিস থেকে লণ্ডনে এলেম—এমন বিষণ্ণ অন্ধকারপুরী আর কখনো দেখিনি—ধোঁয়া, মেঘ, বৃষ্টি, কোয়াসা, কাদা আর লোকজনের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। আমি দুই এক ঘণ্টামাত্র লণ্ডনে ছিলেম—যখন লণ্ডন পরিত্যাগ করলেম তখন নিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে বাঁচলেম—আমার বন্ধুরা আমাকে বললেন, লণ্ডনের সঙ্গে প্রথম দৃষ্টিতেই ভালোবাসা হয় না ; কিছুদিন থেকে তাকে ভালো ক'রে চিনলে তবে লণ্ডনের মাধুর্য্য বোঝা যায়।

দ্বিতীয় পত্র

ইংলণ্ডে আসবার আগে আমি নির্ব্বোধের মতো আশা করেছিলেম যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের দুইহস্ত পরিমিত ভূমির সর্ব্বত্রই গ্ল্যাডষ্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্ষমূলরের বেদ-ব্যাখ্যা, টিণ্ড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব,

কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্রে মুখরিত। সৌভাগ্যক্রমে তাতে আমি নিরাশ হয়েছি। মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনি চলছে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে কোলাহল শোনা যায়। মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে থাকে তুমি নাচে গিয়েছিলে কিনা, কন্সর্ট কেমন লাগ্‌ল, থিয়েটরে একজন নূতন এক্‌টর এসেছে, কাল অমুক জায়গায় ব্যাণ্ড হবে ইত্যাদি। পুরুষেরা বলবে, আফগান-যুদ্ধের বিষয় তুমি কী বিবেচনা করো, Marquis of Lorneকে লণ্ডনীয়েরা খুব সমাদর করেছিল, আজ দিন বেশ ভালো, কালকের দিন বড়ো মিজরেব্‌ল্‌ ছিল। এদেশের মেয়েরা পিয়নো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতে যুবকদের সঙ্গে ফ্লর্ট্‌ করে। এদেশের চির-আয়বুড়ো মেয়েরা কাজের লোক। Temperance meeting, Workingmen's Society প্রভৃতি যত প্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহল আছে, সমুদয়ের মধ্যে তাঁদের কণ্ঠ আছে। পুরুষদের মতো তাঁদের আপিসে যেতে হয় না; মেয়েদের মতো ছেলেপিলে মানুষ করতে হয় না, এদিকে হয়তো এত বয়স হয়েছে যে "বলে" গিয়ে নাচা বা ফ্লর্ট্‌ ক'রে সময় কাটানো সঙ্গত হয় না, তাই তাঁরা অনেক কাজ করতে পারেন, তাতে উপকারও হয়তো আছে।

এখানে দ্বারে দ্বারে মদের দোকান। আমি রাস্তায় বেরলে জুতোর দোকান, দরজীর দোকান, মাংসের দোকান, খেলনার দোকান পদে পদে দেখতে পাই, কিন্তু বইয়ের দোকান প্রায় দেখতে পাইনে। আমাদের একটি কবিতার বই কেনবার আবশ্যক হয়েছিল, কিন্তু

কাছাকাছির মধ্যে বইয়ের দোকান না দেখে একজন খেলনা-ওয়ালাকে সেই বই আনিয়ে দিতে হুকুম করতে হয়েছিল—আমি আগে জানতেম, এদেশে একটা কসাইয়ের দোকান যেমন প্রচুররূপে দরকারী বইয়ের দোকানও তেমনি।

ইংলণ্ডে এলে সকলের চেয়ে চোখে পড়ে লোকের ব্যস্ততা। রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদের মুখ দেখতে মজা আছে—বগলে ছাতি নিয়ে হুস্ হুস্ ক'রে চলেছে, পাশের লোকদের উপর ভ্রূক্ষেপ নেই, মুখে যেন মহা উদ্বেগ, সময় তাঁদের ফাঁকি দিয়ে না পালায় এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। সমস্ত লণ্ডনময় রেলোয়ে। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এক একটা ট্রেন যাচ্চে। লণ্ডন থেকে ব্রাইটনে আসবার সময় দেখি, প্রতি মুহূর্ত্তে উপর দিয়ে একটা, নিচে দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে একটা, এমন চারিদিক থেকে হুস্‌হাস্ ক'রে ট্রেন ছুটেছে। সে ট্রেনগুলোর চেহারা লণ্ডনের লোকদেরই মতো; এদিক থেকে ওদিক থেকে মহা ব্যস্তভাবে হাঁস্ ফাঁস্ করতে করতে চলেছে। দেশ তো এই এক রত্তি, দুপা চল্‌লেই ভয় হয় পাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, এখানে এত ট্রেন যে কেন ভেবে পাইনে! আমরা একবার লণ্ডনে যাবার সময় দৈবাৎ ট্রেন মিস্ করেছিলেম, কিন্তু তার জন্যে বাড়ি ফিরে আস্‌তে হয়নি, তার আধ ঘণ্টা পরেই আর এক ট্রেন এসে হাজির।

এদেশের লোক প্রকৃতির আদুরে ছেলে নয়, কারুর নাকে তেল দিয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে থাকবার জো নেই। একে তো আমাদের দেশের মতো এদেশের জমিতে আঁচড় কাট্‌লেই শস্য হয় না, তাতে শীতের সঙ্গে মারামারি করতে হয়। তা ছাড়া শীতের উপদ্রবে এদের কত কাপড় দরকার হয় তার ঠিক নেই—তার পরে কম খেলে এদেশে বাঁচবার জো নেই; শরীরে তাপ জন্মাবার জন্যে অনেক খাওয়া চাই।

এদেশের লোকের কাপড়, কয়লা, খাওয়া অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে না থাক্‌লে চলে না, তার উপরে আবার মদ আছে। আমাদের বাংলার খাওয়া নামমাত্র, কাপড় পরাও তাই। এদেশে যার ক্ষমতা আছে সেই মাথা তুলতে পারে, দুর্ব্বল লোকদের এখানে রক্ষা নেই—একে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ তাতে কার্য্যক্ষেত্রে সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোখারুখি করছে।

ক্রমে ক্রমে এখানকার দুই একজন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হোতে চল্‌ল। একটা মজা দেখছি, এখানকার লোকেরা আমাকে নিতান্ত অবুঝের মতো মনে করে। একদিন Dr—এর ভাইয়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছিলেম—একটা দোকানের সম্মুখে কতকগুলো ফোটোগ্রাফ ছিল; সে আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে ফোটোগ্রাফের ব্যাখ্যান আরম্ভ ক'রে দিলে—আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, এক রকম যন্ত্র দিয়ে ঐ ছবিগুলো তৈরি হয়, মানুষে হাতে ক'রে আঁকে না। আমার চারদিকে লোক দাঁড়িয়ে গেল। একটা ঘড়ির দোকানের সামনে নিয়ে, ঘড়িটা যে খুব আশ্চর্য্য যন্ত্র তাই আমার মনে সংস্কার জন্মাবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। একটা ঈভ্‌নিং পার্টিতে মিস্—আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি এর পূর্ব্বে পিয়নোর শব্দ শুনেছি কী না? এ দেশের অনেক লোক হয়তো পরলোকের একটা ম্যাপ এঁকে দিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যদি একবিন্দুও খবর জানে। ইংলণ্ড থেকে কোনো দেশের যে কিছু তফাৎ আছে তা তারা কল্পনাও করতে পারে না। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক্—সাধারণ লোকেরা কত বিষয় জানে না তার ঠিক নেই।

তৃতীয় পত্র

আমরা সেদিন "ফ্যান্সি-বলে" অর্থাৎ ছদ্মবেশী নাচে গিয়েছিলেম—কত মেয়ে পুরুষ নানারকম সেজেগুজে সেখানে নাচ্‌তে গিয়েছিল। প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাকীর্ণ, চারিদিকে ব্যাণ্ড বাজছে—৬।৭০০ সুন্দরী, সুপুরুষ। ঘরে ন স্থানং তিল ধারয়েৎ—চাঁদের হাট তো তাকেই বলে। এক-একটা ঘরে দলে দলে স্ত্রীপুরুষে হাত ধরাধরি ক'রে ঘুরে ঘুরে নাচ আরম্ভ করেছে, যেন জোড়া জোড়া পাগলের মতো। এক একটা ঘরে এমন ৭০।৮০ জন যুগলমূর্ত্তি, এমন ঘেঁসাঘেঁসি যে, কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নেই। একটা ঘরে শ্যাম্পেনের কুরুক্ষেত্র পড়ে গিয়েছে, মদ্য মাংসের ছড়াছড়ি, সেখানে লোকারণ্য; এক একটা মেয়ের নাচের বিরাম নেই, দু তিন ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত তার পা চলছে। একজন মেম তুষার-কুমারী সেজে গিয়েছিলেন, তাঁর সমস্তই শুভ্র, সর্ব্বাঙ্গে পুঁতির সজ্জা, আলোতে ঝক্‌মক্ করছে। একজন মুসলমানিনী সেজেছিলেন; একটা লাল ফুলো ইজের, উপরে একটা রেশমের পেশোয়াজ, মাথায় টুপির মতো;—এ কাপড়ে তাঁকে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। একজন সেজেছিলেন আমাদের দিশি মেয়ে, একটা সাড়ি আর একটা কাঁচুলি তাঁর প্রধান সজ্জা, তার উপরে একটা চাদর তাতে ইংরেজি কাপড়ের চেয়ে তাঁকে ঢের ভালো দেখাচ্ছিল। একজন সেজেছিলেন বিলিতি দাসী। আমি বাংলার জমিদার সেজেছিলেম, জরী দেওয়া মখমলের কাপড়, জরী দেওয়া মখমলের পাগড়ি প্রভৃতি পরেছিলেম। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ অযোধ্যার তালুকদার সেজে গিয়েছিলেন, সাদা রেশমের ইজের জরীতে খচিত, সাদা রেশমের চাপকান, সাদা রেশমের জোব্বা, জরীতে ঝকমকায়মান পাগড়ি,

জরীর কোমরবন্দ—তাঁর সজ্জা। অযোধ্যার তালুকদারেরা যে এই রকম কাপড় পরে তা হয়তো নয়, কিন্তু ধরা পড়বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের মধ্যে একব্যক্তি আফগান সেনাপতি সেজেছিলেন।

গত মঙ্গলবারে আমরা এক ভদ্রলোকের বাড়িতে নাচের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেম। সন্ধ্যেবেলায় কোথাও নিমন্ত্রণে যেতে হোলে শীতের জন্য সচরাচর মোটা কাপড় পরতে হয়, কিন্তু ঈভ্‌নিং পার্টি প্রভৃতিতে পাতলা কালো বনাতের কাপড় পরাই রীতি। সান্ধ্য পরিচ্ছদের কামিজটি একেবারে নিষ্কলঙ্ক ধব-ধরে সাদা হওয়া চাই, তার উপরে প্রায় -সমস্ত-বুকখোলা এক বনাতের ওয়েষ্ট কোট, কালো ওয়েষ্ট কোটের মধ্যে সাদা কামিজের সুমুখ দিকটা বেরিয়ে থাকে, গলায় সাদা ফিতে (necktie) বাঁধা, সকলের উপর একটি টেল-কোট (লাঙুল-কোট); টেলকোটের সুমুখ দিকটা কোমর পর্য্যন্ত কাটা, আমাদের চাপকান প্রভৃতি পোষাকগুলি যেমন হাঁটু পর্য্যন্ত পড়ে, এ তা নয়। এর সুমুখ দিকটার সীমা কোমর পর্য্যন্ত, কিন্তু পিছন দিকটা কাটা নয়, সুতরাং কতকটা ল্যাজের মতো ঝুলতে থাকে। ইংরাজদের হনুকরণে এই ল্যাজ-কোট পরতে হোলো। নাচ পার্টিতে যেতে হোলে হাতে এক জোড়া সাদা দস্তানা পরা চাই, কারণ যে মহিলাদের হাতে হাত দিয়ে নাচতে হবে, খালি হাত লেগে তাঁদের হাত ময়লা হয়ে যেতে পারে কিম্বা তাঁদের হাতে যদি দস্তানা থাকে সেটা ময়লা হবার ভয় আছে। অন্য কোনো জায়গায় লেডিদের সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড করতে গেলে হাতের দস্তানা খুলে ফেলতে হয়, কিন্তু নাচের ঘরে তার উল্টো।

যাহোক, আমরা তো সাড়ে নটার সময় তাঁদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখনও নাচ আরম্ভ হয় নি। ঘরের দুয়ারের কাছে গৃহকর্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি বিশেষ পরিচিতদের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করছেন,

অপরিচিতদের প্রতি শিরঃকম্পন ও সকলকে অভ্যর্থনা করছেন। এ গোরাদের দেশে নিমন্ত্রণসভায় গৃহকর্ত্তার বড়ো উঁচুপদ নেই, তিনি সভায় উপস্থিত থাকুন বা শয়নগৃহে নিদ্রা দিন, তাতে কারো বড়ো কিছু এসে যায় না। আমরা ঘরে প্রবেশ করলেম, গ্যাসের আলোয় ঘর উজ্জ্বল, শত শত রমণীর রূপের আলোকে গ্যাসের আলো ম্রিয়মাণ; রূপের উৎসব পড়ে গিয়েছে, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবামাত্রই চোখে ধাঁধা লেগে যায়। ঘরের একপাশে পিয়নো, বেহালা, বাঁশি বাজছে, ঘরের চারিধারে কৌচ, চৌকি সাজানো, ইতস্ততঃ দেয়ালের আয়নার উপর গ্যাসের আলো ও রূপের প্রতিবিম্ব পড়ে ঝক্‌মক্ করছে। নাচবার ঘরের মেজে কাঠের, তার উপর কার্পেট প্রভৃতি কিছু পাতা নেই, সে কাঠের মেজে এমন পালিশ করা যে পা পিছলে যায়। ঘর যত পিছল হয় ততই নাচবার উপযুক্ত হয়, কেননা পিছল ঘরে নাচের গতি সহজ হয়, কোনো বাধা পায় না, আপনা-আপনি পিছলে আসে। ঘরের চারিদিকে আশেপাশে যে সকল বারান্দার মতো আছে, তাই একটু ঢেকেঢুকে, গাছপালা দিয়ে, দুএকটি কৌচ চৌকি রেখে তাকে প্রণয়ীদের কুঞ্জ নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেইখানে, নাচে শ্রান্ত হয়ে বা কোলাহলে বিরক্ত হয়ে যুবক যুবতী নিরিবিলি মধুরালাপে মগ্ন থাকতে পারেন। ঘরে ঢোকবার সময় সকলের হাতে সোনার অক্ষরে ছাপা এক একখানি কাগজ দেওয়া হয়, সেই কাগজে কী কী নাচ হবে তাই লেখা থাকে। ইংরেজি নাচ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, এক রকম হচ্চে স্ত্রী পুরুষে মিলে ঘুরে ঘুরে নাচা, তাতে কেবল দু জন লোক একসঙ্গে নাচে; আর এক রকম নাচে চারটি জুড়ি নর্ত্তক নর্ত্তকী চতুষ্কোণ হয়ে সুমুখা-সুমুখী দাঁড়ায় ও হাত ধরাধরি করে নানা ভঙ্গীতে চলাফেরা করে বেড়ায়, কোনো কোনো সময়

চার জুড়ি না হয়ে আট জুড়িও হয়। ঘুরে ঘুরে নাচাকে রৌণ্ড্ ডান্স্ বলে ও চলা-ফেরা করে নাচার নাম স্কোয়ার ডান্স্। নাচ আরম্ভ হবার পূর্ব্বে গৃহকর্ত্রী, মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে আলাপ করিয়ে দেন, অর্থাৎ পুরুষ-অভ্যাগতকে সঙ্গে ক'রে কোনো এক অভ্যাগত-মহিলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন "মিস্ অমুক, ইনি মিষ্টর অমুক।" অমনি মিস্ ও মিষ্টর শিরঃকম্পন করেন। কোনো মিসের সঙ্গে পরিচয় হবার পর নাচবার ইচ্ছে করলে পকেট থেকে সেই সোনার জলে ছাপানো প্রোগ্রামটি বের ক'রে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হয় "আপনি কি অমুক নৃত্যে বাকদত্তা হয়ে আছেন?" তিনি যদি 'না' বলেন তাহোলে তাঁকে বল্‌তে হবে "তবে আমি কি আপনার সঙ্গে নাচবার সুখভোগ করতে পারি?" তিনি থ্যাঙ্ক্‌য়ু বললে বোঝা যাবে কপালে তাঁর সঙ্গে নাচবার সুখ আছে। অমনি সেই কাগজটিতে সেই নাচের পাশে তাঁর নাম এবং তাঁর কাগজে আবেদনকারীর নাম লিখে দিতে হয়।

নাচ আরম্ভ হোলো। ঘুর্-ঘুর্-ঘুর্। একটা ঘরে মনে করো, চল্লিশ পঞ্চাশ জুড়ি নাচছে, ঘেঁসাঘেঁসি, ঠেলাঠেলি, কখনো বা জুড়িতে জুড়িতে ধাক্কাধাক্কি। তবু ঘুর্-ঘুর্-ঘুর্। তালে তালে বাজনা বাজছে, তালে তালে পা পড়ছে, ঘর গরম হয়ে উঠেছে। একটা নাচ শেষ হোলো, বাজনা থেমে গেল; নর্ত্তক মহাশয় তাঁর শ্রান্ত সহচরীকে আহারের ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে টেবিলের উপর ফল মূল মিষ্টান্ন মদিরার আয়োজন; হয়তো আহার পান করলেন, না হয় দুজনে নিভৃত কুঞ্জে বসে রহস্যালাপ করতে লাগলেন। আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড়ো মিলে মিশে নিতে পারিনে,যে নাচে আমি একেবারে সুপণ্ডিত,সে নাচও নতুন লোকের সঙ্গে নাচতে পারিনে। সত্যি কথা বলতে কি, নাচের নেমন্তন্ন-গুলো

আমার বড়ো ভালো লাগে না। যাদের সঙ্গে বিশেষ আলাপ আছে, তাদের সঙ্গে নাচতে মন্দ লাগে না। যেমন তাস খেলবার সময়ে খারাপ জুড়ি পেলে তার 'পরে তার দলের লোক চটে যায়, তেমনি নাচের সময় খারাপ জুড়ির পরে মেয়েরা তারি চটে যায়। আমার নাচের সহচরী বোধ হয় নাচবার সময় মনে মনে আমার মরণ কামনা করেছিলেন। নাচ ফুরিয়ে গেল, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম, তিনিও নিস্তার পেলেন।

প্রথমে নাচের ঘরে ঢুকেই আমি একেবারে চমকে উঠেছিলেম ; দেখি যে শত শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে আমাদের একটি ভারতবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী রয়েছেন। দেখেই তো আমার বুকটা একেবারে নেচে উঠেছিল। তার সঙ্গে কোনো মতে আলাপ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেম। কতদিন শ্যামলা মুখ দেখিনি! আর, তার মুখে আমাদের বাঙালি মেয়েদের ভালোমানুষী নম্রভাব মাখানো। আমি অনেক ইংরেজ মেয়েদের মুখে ভালোমানুষী নরম ভাব দেখেছি কিন্তু এর সঙ্গে তার কী একটা তফাৎ আছে বলতে পারিনে। তার চুল বাঁধা আমাদের দেশের মতো। শাদা মুখ আর উগ্র অসঙ্কোচ সৌন্দর্য্য দেখে দেখে আমার মনটা ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল, এতদিনে তাই বুঝতে পারলেম। হাজার হোক, ইংরেজ মেয়েরা সম্পূর্ণ আলাদা জাত, আমি এতদূর ইংরেজী কায়দা শিখিনি যে তাদের সঙ্গে বেশ খোলাখুলি ভাবে কথাবার্ত্তা কইতে পারি। পরিচিত বাঁধি গতের সীমা লঙ্ঘন করতে সাহস হয় না।

আজ ব্রাইটনের অনেক তপস্যার ফলে সূর্য্য উঠেছেন। এদেশে রবি যেদিন মেঘের অন্তঃপুর থেকে বের হন্, সেদিন একটি লোকও কেউ ঘরে থাকে না। সেদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াবার রাস্তায় লোক কিল্‌বিল্

কর্‌তে থাকে। এদেশে যদিও "বাড়ির ভিতর" নেই, তবু এদেশে মেয়েরা যেমন অসূর্য্যম্পশ্যরূপা এমন আমাদের দেশে নয়।

সাড়ে আট্‌টার কমে আমাদের বিছানা থেকে ওঠ হয় না, ছটার সময় বিছানা থেকে উঠ্‌লে এখানকার লোকেরা আশ্চর্য্য হয়। তার পরে উঠেই আমি রোজ ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। এ দেশে যাকে স্নান বলে, আমি সে রকম স্নানের বিড়ম্বনা করি নে। আমি মাথায় জল ঢেলে স্নান করি, গরম জলে নয়। এখানকার এই বরফের মতো ঠাণ্ডা জল। নটার সময় আমাদের খাবার আসে। এখানকার ন'টা আর সেখানকার ছ'টা সমান। আমাদের আর একটি খাওয়া দেড়টার সময়, সেইটিই প্রধান খাওয়া—মধ্যাহ্ন ভোজন। মধ্যে একবার চা রুটি প্রভৃতি আসে তার পরে রাত আট্‌টার সময় আর একটি সুপ্রশস্ত ভোজনের আয়োজন হয়ে থাকে, এই রকম আমাদের দিনের প্রধান বিভাগগুলি খাওয়া নিয়ে।

অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে, চারটে বাজে ব'লে, চারটে বাজলে পরে আলো না জ্বেলে পড়া দুষ্কর। এখানে প্রকৃতপক্ষে ন'টার সময় দিন আরম্ভ হয়, কেননা গড়ে রোজ আট্‌টার কমে ওঠা হয় না। তার পরে আবার বৈকাল চারটের সময়েই এখানকার দিনের আলো নিভে যায়। দিনগুলো যেন দশটা চারটে আপিস্ করতে আসে। ট্যাক-ঘড়ির ডালা খুলতে খুল্‌তেই এদেশের দিন চলে যায়। এখানকার রাত্তির তেমনি ঘোড়ায় চড়ে আসে, আর পায়ে হেঁটে ফেরে।

মেঘ, বৃষ্টি, বাদল, অন্ধকার, শীত—এ আর এক দণ্ডের তরে ছাড়া নেই। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয়, তখন মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়—তাতে একটা কেমন উল্লাসের ভাব আছে; এখানে এ তা নয়, এ টিপ্‌-টিপ্‌ ক'রে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতি

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চল্‌ছে তো চল্‌ছেই। রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, কাঁচের জান্‌লার উপর টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে জল ছিটিয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে স্তরে স্তরে মেঘ করে, এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে, মনে হয় কোনো কারণে আকাশের রংটা ঘুলিয়ে গিয়েছে, সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবরজঙ্গমের একটা অবসন্ন মুখশ্রী। লোকের মুখে সময়ে সময়ে শুন্‌তে পাই বটে যে, কাল বজ্র ডেকেছিল, কিন্তু বজ্রের নিজের এমন গলার জোর নেই যে, তাঁর মুখ থেকেই সে খবরটা পাই। সূর্য্য তো এখানে গুজবের মধ্যে হয়ে পড়েছে। যদি অনেক ভাগ্যবলে সকালে উঠে সূর্য্যের মুখ দেখতে পাই, তবে তখনি আমার মনে হয়,—

"এমন দিন না র'বে—তা জানো।"

দিনে দিনে শীত খুব ঘনিয়ে আস্‌ছে ; লোকে বলছে, কাল পরশুর মধ্যে হয়তো আমরা বরফ পড়া দেখতে পাব। তাপমান যন্ত্র ত্রিশ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নেবে গিয়েছে—সেই তো হচ্চে ফ্রীজিঙ পয়েণ্ট। অল্প স্বল্প ফ্রষ্ট্‌ দেখা দিয়েছে। রাস্তার মাটি খুব শক্ত। কেননা তার মধ্যে যা জল ছিল সমস্ত জমাট হয়ে গিয়েছে। রাস্তার মাঝে মাঝে কাঁচের টুক্‌রোর মতো শিশির খুব শক্ত হয়ে জমেছে। দুই এক জায়গায় ঘাসের মধ্যে কে যেন চুন ছড়িয়ে দিয়েছে,—বরফের এই প্রথম সূত্রপাত। খুবই শীত পড়েছে, এক এক সময়ে হাত পা এমন ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে জ্বালা করতে থাকে। সকালে লেপ থেকে বেরোতে ভাবনা হয়।

আমাদের দিশি কাপড় দেখে রাস্তার এক একজন সত্যি সত্যি হেসে ওঠে, এক একজন এত আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে তাদের আর হাসবার ক্ষমতা থাকে না। কত লোক হয়তো আমাদের জন্যে গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে, প্যারিসে আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে এক দল

ইস্কুলের ছোকরা চীৎকার করতে করতে ছুটেছিল, আমরা তাদের সেলাম করলেম। এক একজন আমাদের মুখের উপর হেসে ওঠে, এক এক জন চেঁচাতে থাকে—"Jack, look at the blackies !"

চতুর্থ পত্র

আমরা সেদিন হৌস্ অফ্ কমন্সে গিয়েছিলেম। পার্ল্যামেণ্টের অভ্রভেদী চূড়া, প্রকাণ্ড বাড়ি, হাঁ-করা ঘরগুলো দেখলে তাক লেগে যায়। একটা বড়ো ঘরে হৌস্ বসে, ঘরের চারিদিকে গোল গ্যালারী, তার একদিকে দর্শকেরা আর একদিকে খবরের কাগজের রিপোর্টররা। গ্যালারী অনেকটা থিয়েটরের ড্রেস্ সার্কেলের মতো। গ্যালারীর নিচে ষ্টলে মেম্বররা বসে। তাদের জন্যে দুপাশে হদ্দ দশখানি বেঞ্চি। এক পাশে পাঁচখানি বেঞ্চিতে গবর্ণমেণ্টের দল, আর এক পাশের পাঁচখানিতে বিপক্ষ দল। সমুখের প্ল্যাটফর্ম্মের উপর একটা কেদারা আছে—সেইখানে প্রেসিডেণ্টের মতো একজন (যাকে স্পীকর বলে) মাথায় পরচুলা প'রে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বসে থাকেন। যদি কেউ কখনো কোনো অন্যায় ব্যবহার বা কোনো আইনবিরুদ্ধ কাজ করে তাহোলে স্পীকর উঠে তাকে বাধা দেয়। যেখানে খবরের কাগজের রিপোর্টররা সব বসে, তার পিছনে খড়খড়ি-দেওয়া একটা গ্যালারিতে মেয়েদের জায়গা, বাইরে থেকে তাদের দেখা যায় না। আমরা যখন গেলেম, তখন ওডনেল বলে এক জন আইরিশ সভ্য ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, প্রেস এক্টের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে তিনি আন্দোলন করছিলেন। তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল। হৌসের ভাবগতিক দেখে আমি আশ্চর্য্য

হয়ে গিয়েছিলেম। যখন একজন কেউ বক্তৃতা করছে, তখন হয়তো অনেক মেম্বর মিলে "ইয়া" "ইয়া" "ইয়া" "ইয়া" ক'রে চীৎকার করছে, হাসছে। আমাদের দেশে সভাস্থলে ইস্কুলের ছোকরারাও হয়তো এমন করে না। অনেক সময়ে বক্তৃতা হচ্চে আর মেম্বররা কপালের উপর টুপি টেনে দিয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্চেন। একবার দেখলেম যে ভারতবর্ষের বিষয় নিয়ে একটা বক্তৃতার সময় ঘরে নয় দশ জনের বেশি মেম্বর ছিল না, অন্যান্য সবাই ঘরের বাইরে হাওয়া খেতে, বা সপর খেতে গিয়েছেন; আর যেই ভোট্ নেবার সময় হোলো অমনি সবাই চারদিক থেকে এসে উপস্থিত। বক্তৃতা শুনে বা কোনোপ্রকার যুক্তি শুনে যে কারো মত স্থির হয়, তা তো বোধ হোলো না।

গত বৃহস্পতিবারে হৌস্ অফ কমন্সে ভারতবর্ষ নিয়ে খুব বাদানুবাদ চলেছিল। সেদিন ব্রাইট সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে, গ্ল্যাডষ্টোন তূলা-জাতের শুল্ক ও আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে, ভারতবর্ষীয়দের দরখাস্ত দাখিল করেন। চারটের সময় পার্ল্যামেণ্ট খোলে। আমরা কয়েকজন বাঙালি চারটে না বাজতেই হৌসে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখন হৌস খোলে নি, দর্শনার্থীরা হৌসের বাইরে একটা প্রকাণ্ড ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের চারদিকে বর্ক, ফক্স, চ্যাটহাম, ওয়লপোল, প্রভৃতি রাজনীতিবিশারদ মহাপুরুষদের প্রস্তর মূর্ত্তি। প্রতি দরজার কাছে পাহারওয়ালা পাকাচুলের পরচুলা-পরা। গাউন ঝোলানো পার্ল্যামেণ্টের কর্ম্মচারীরা হাতে দুই একটা খাতাপত্র নিয়ে আনাগোনা করছিলেন। চারটের সময় হৌস খুলল। আমাদের কাছে স্পীকর্স গ্যালেরির টিকিট ছিল। হৌস্ অফ কমন্সে পাঁচ শ্রেণীর গ্যালারী আছে,—ষ্ট্রেঞ্জর্স গ্যালেরি, স্পীকর্স গ্যালেরি, ডিপ্লম্যাটিক্ গ্যালেরি, রিপোর্টস্ গ্যালেরি, লেডিজ গ্যালেরি। হৌসের যে কোনো মেম্বরের কাছ থেকে বৈদেশিক গ্যালারির টিকিট

পাওয়া যায়, আর বক্তার অনুগ্রহ হোলে তবে বক্তার গ্যালারীর টিকিট পাওয়া যেতে পারে। ডিপ্লম্যাটিক্ গ্যালেরিটা কী পদার্থ তা ভালো ক'রে বলতে পারিনে, আমি যে কবার হৌসে গিয়েছি দু-একজন ছাড়া সেখানে লোক দেখতে পাইনি। ষ্ট্রেঞ্জর্স গ্যালেরি থেকে বড়ো ভালো দেখা শুনো যায়না ; তার সামনে স্পীকর্স গ্যালেরি ; তার সামনে ডিপ্লম্যাটিক গ্যালেরি। আমরা গিয়ে তো বসলেম। পরচুলাধারী স্পীকর মহাশয় গরুড় পক্ষীটির মতো তাঁর সিংহাসনে উঠলেন। হৌসের সভ্যেরা সব আসন গ্রহণ করলেন। কাজ আরম্ভ হোলো। হৌসের প্রথম কাজ প্রশ্নোত্তর করা। হৌসের পূর্ব্ব অধিবেশনে এক এক জন মেম্বর ব'লে রাখেন যে "আগামী বারে আমি অমুক অমুক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবব, তার উত্তর দিতে হবে।" সেদিন ওডনেল নামে একজন আইরিশ মেম্বর জিজ্ঞাসা করলেন যে, "একো এবং আবো দুই একটি খবরের কাগজে জুলুদের প্রতি ইংরাজ সৈন্যদের অত্যাচারের যে বিবরণ বেরিয়েছে, সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কি কোনো সংবাদ পেয়েছেন ? আর সে সকল অত্যাচার কি খৃষ্টানদের অনুচিত নয় ?" অমনি গবর্ণমেণ্টের দিক থেকে সার মাইকেল হিকস্‌বিচ উঠে ওডোনেলকে কড়া কড়া দুই এক কথা শুনিয়ে দিলেন, অমনি একে একে যত আইরিশ মেম্বর ছিলেন, সকলে উঠে তার কড়া কড়া উত্তর দিতে লাগলেন,—এই রকম অনেকক্ষণ ঝগড়া ঝাঁটি ক'রে দুই পক্ষ শান্ত হয়ে বসলেন। উত্তর প্রত্যুত্তরের ব্যাপার সমাপ্ত হোলে পর যখন বক্তৃতা করবার সময় এল, তখন হৌস থেকে অধিকাংশ মেম্বর উঠে চলে গেলেন। দুই একটা বক্তৃতার পর ব্রাইট উঠে সিভিল সার্ভিসের রাশি রাশি দরখাস্ত হৌসে দাখিল করলেন। বৃদ্ধ ব্রাইটকে দেখলে অত্যন্ত ভক্তি হয়, তাঁর মুখে ঔদার্য্য ও দয়া যেন মাখানো। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাইট সেদিন কিছু

বক্তৃতা করলেন না। হৌসে অতি অল্প মেম্বরই অবশিষ্ট ছিলেন, যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিদ্রার আয়োজন করছিলেন, এমন সময়ে গ্ল্যাডষ্টোন উঠলেন। গ্ল্যাডষ্টোন ওঠবামাত্র সমস্ত ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, গ্ল্যাডষ্টোনের স্বর শুনতে পেয়ে আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দলে দলে মেম্বর আসতে লাগলেন, দুই দিকের বেঞ্চি পূরে গেল। তখন পূর্ণ উৎসের মতো গ্ল্যাডষ্টোনের বক্তৃতা উৎসারিত হোতে লাগল। কিছুমাত্র চীৎকার, তর্জ্জন গর্জ্জন ছিল না, অথচ তাঁর প্রতি-কথা, ঘরের যেখানে যে কোনো লোক বসেছিল, সকলেই একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। গ্ল্যাডষ্টোনের কী এক রকম দৃঢ় স্বরে বলবার ধরণ আছে, তাঁর প্রতি-কথা মনের ভিতর গিয়ে যেন জোর ক'রে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়। একটা কথায় জোর দেবার সময় তিনি মুষ্টি বদ্ধ ক'রে একেবারে নুয়ে নুয়ে পড়েন যেন প্রত্যেক কথা তিনি একেবারে নিংড়ে নিংড়ে বের করছেন। আর সেই রকম প্রতি জোর-দেওয়া কথা দরজা ভেঙে চুরে যেন মনের ভিতর প্রবেশ করে। গ্ল্যাডষ্টোন অনর্গল বলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রতি-কথা ওজন করা, তার কোনো অংশ অসম্পূর্ণ নয়; তিনি বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমস্বরে জোর দিয়ে বলেন না, কেননা সে-রকম বলপূর্ব্বক বললে স্বভাবতই শ্রোতাদের মন তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়, তিনি যে কথায় জোর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন, সেই কথাতেই জোর দেন; তিনি খুব তেজের সঙ্গে বলেন বটে, কিন্তু চীৎকার ক'রে বলেন না, মনে হয় যা বলছেন, তাতে তাঁর নিজের খুব আন্তরিক বিশ্বাস।

গ্ল্যাডষ্টোনের বক্তৃতাও যেমন থামল, অমনি হৌস শূন্যপ্রায় হয়ে গেল, দুদিকের বেঞ্চিতে ৬।৭ জনের বেশি আর লোক ছিল না।

ম্যাডষ্টোনের পর স্মলেট যখন বক্তৃতা আরম্ভ করলেন তখন দুই দিককার বেঞ্চিতে লোক ছিল না বললেও হয়; কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হবার পাত্র নন, শূন্য হৌস্‌কে সম্বোধন ক'রে অত্যন্ত দীর্ঘ এক বক্তৃতা করলেন। সেই অবকাশে আমি অত্যন্ত দীর্ঘ নিদ্রা দিই। দুই একজন মেম্বর, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কেউ বা পরস্পর গল্প করছিলেন, কেউ বা চোখের উপর টুপি টেনে দিয়ে ডিস্‌রেলীর পদচ্যুতির পর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছিলেন।

হৌসে আইরিশ মেম্বরদের ভারি মুস্কিল; তাঁরা যখন বক্তৃতা করতে ওঠেন, তখন চারিদিক থেকে ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ হয়, মেম্বরেরা হাঁসের মতো "ইয়া" "ইয়া" ক'রে চেঁচাতে থাকে। বিদ্রূপাত্মক "hear" "hear" শব্দে বক্তৃতার স্বর ডুবে যায়। এই রকম বাধা পেয়ে বক্তা আর আত্মসম্বরণ করতে পারেন না, খুব জ্বলে ওঠেন, আর তিনি যতই রাগ করতে থাকেন ততই হাস্যাস্পদ হন। আইরিশ মেম্বরেরা এই রকম জ্বালাতন হয়ে আজকাল শোধ তুলতে আরম্ভ করেছেন। হৌসে যে কোনো কথা ওঠে, প্রায় সকল বিষয়েই তাঁরা বাধা দেন, আর প্রতি প্রস্তাবে এক জনের পর আর একজন ক'রে উঠে দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতায় হৌসকে বিব্রত ক'রে তোলেন।

পঞ্চম পত্র

বিলেতে নতুন এসেই বাঙালিদের চোখে কোন্ জিনিষ ঠেকে, বিলিতি সমাজে নতুন মিশে প্রথমে বাঙালিদের কী রকম লাগে, সে সকল বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপাততঃ কিছু বলব

না। কেননা, এ সকল বিষয় আমার বিচার করবার অধিকার নেই, যাঁরা পূর্ব্বে বিলেতে অনেক কাল ছিলেন, ও বিলেত যাঁরা খুব ভালো ক'রে চেনেন, তাঁরা আমাকে সঙ্গে ক'রে এনেছেন,আর তাঁদের সঙ্গেই আমি বাস করছি। বিলাতে আসবার আগেই বিলেতের বিষয় তাঁদের কাছে অনেক শুনতে পেতেম, সুতরাং এখানে এসে খুব অল্প জিনিষ নিতান্ত নূতন মনে হয়েছে। এখানকার লোকের সঙ্গে মিশতে গিয়ে প্রতি পদে হুঁচট্ খেয়ে খেয়ে আচার ব্যবহার আমাকে শিখতে হয়নি। তাই ভাবছি যে, আমার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় আপাততঃ তোমাদের কিছু বলব না। এখানকার দুই একজন বাঙালির মুখে তাঁদের যে রকম বিবরণ শুনেছি তাই তোমাদের লিখছি।

জাহাজে তাঁরা উঠলেন। যাত্রীদের সেবার জন্যে জাহাজে অনেক ইংরেজ চাকর থাকে, তাদের নিয়েই প্রথম গোল বাধে। এঁরা অনেকে তাদের "সার সার" ব'লে সম্বোধন করতেন, তাদের কোনো কাজ করতে হুকুম দিতে তাঁদের বাধ-বাধ করত। জাহাজে তাঁরা অত্যন্ত সসঙ্কোচভাবে থাকতেন। তাঁরা বলেন, সকল বিষয়েই তাঁদের যে ও রকম সঙ্কোচ বোধ হোত, সেটা কেবল ভয়ে নয়, তার সঙ্গে কতকটা লজ্জাও আছে। যে কাজ করতে যান, মনে হয় পাছে বেদস্তুর হয়ে পড়ে। জাহাজে ইংরেজদের সঙ্গে মেশা বড়ো হয়ে ওঠে না। তারা টাট্‌কা ভারতবর্ষ থেকে আসছে, "হজুর ধর্ম্মাবতার"গণ দেশীলোক দেখলে নাক তুলে, ঘাড় বেঁকিয়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে ভদ্র ইংরেজ দেখতে পাবে, তাঁরা তোমাকে নিতান্ত সঙ্গীহীন দেখে তোমার সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করবেন, তাঁরা যথার্থ ভদ্র, অর্থাৎ ভদ্র ও উচ্চ পরিবারের লোক। এখানকার গলিতে গলিতে যে "জন, জোন্স, টমাস্"-গণ কিল্‌বিল করছে, তারা ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে পদার্পণ করে, সে অঞ্চলে ঘরে ঘরে তাদের

নাম রাষ্ট্র হয়ে যায়, যে রাস্তায় তারা চাবুক হস্তে ঘোড়ায় চড়ে যায় (হয়তো সে চাবুক কেবলমাত্র ঘোড়ার জন্যেই নয়) সে রাস্তাসুদ্ধ লোক শশব্যস্ত হয়ে তাদের পথ ছেড়ে দেয়, তাদের এক একটা ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের এক একটা রাজার সিংহাসন কেঁপে ওঠে, এ রকম অবস্থায় তাদের যে বিকৃতি ঘটে আমি তো তাতে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাইনে। কোনো জন্মে যে-মানুষ ঘোড়া চালায় নি, তাকে ঘোড়া চালাতে দেও, ঘোড়াকে চাবুক মেরে মেরেই জর্জ্জরিত করবে ; সে জানে না যে, একটু লাগাম টেনে দিলেই তাকে চালানো যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে এক একটি ভদ্র সাহেবকে দেখা যায়, তাঁরা আংগ্লো-ইণ্ডিয়ানত্বের ঘোরতর সংক্রামক রোগের মধ্যে থেকেও বিশুদ্ধ থাকেন, অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও ক্ষমতা পেযেও উদ্ধত গর্ব্বিত হয়ে ওঠেন না। সমাজ-শৃঙ্খলছিন্ন হয়ে, সহস্র সেবকদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে ভারতবর্ষে থাকা, উন্নত ও ভদ্র মনের এক প্রকার অগ্নিপরীক্ষা।

যাহোক, এতক্ষণে জাহাজ সাউথ্‌হ্যাম্পটনে এসে পৌঁচেছে। বঙ্গীয় যাত্রীরা বিলেতে এসে পৌঁছলেন। লণ্ডন উদ্দেশে চললেন। ট্রেন থেকে নাববার সময় একজন ইংরাজ গার্ড এসে উপস্থিত। বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, তাঁদের কী প্রয়োজন আছে, কী ক'রে দিতে হবে। তাঁদের মোট নাবিয়ে দিলে ; গাড়ি ডেকে দিলে ; তাঁরা মনে মনে বললেন "বাঃ ! ইংরেজরা কী ভদ্র !" ইংরেজরা যে এত ভদ্র হোতে পারে, তা তাঁদের জ্ঞান ছিল না। তার হস্তে একটি শিলিং গুঁজে দিতে হোলো বটে। তা হোক, একজন নবাগত বঙ্গ-যুবক একজন যে-কোনো শ্বেতাঙ্গের কাছ থেকে একটিমাত্র সেলাম পেতে, অকাতরে এক শিলিং ব্যয় করতে পারেন। আমি যাঁদের কাছ থেকে সব কথা শুনতে

পাই, তাঁরা অনেক বৎসর বিলাতে আছেন, বিলেতের নানা প্রকার ছোটো-খাটো জিনিষ দেখে তাঁদের প্রথম কী রকম মনে হয়েছিল, তা তাঁদের স্পষ্ট মনে নেই। যে সব বিষয় তাঁদের বিশেষ মনে লেগেছিল, তাই এখন তাঁদের মনে আছে।

তাঁরা বিলেতে আসবার পূর্ব্বে তাঁদের বিলিতি বন্ধুরা এখানে তাঁদের জন্যে ঘর ঠিক ক'রে রেখেছিল। ঘরে ঢুকে দেখেন, ঘরে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ছবি টাঙানো, একটা বড়ো আয়না এক জায়গায় ঝোলানো, কৌচ, কতকগুলি চৌকি, দুই একটা কাঁচের ফুলদানি, এক পাশে একটি ছোটো পিয়নো। কী সর্ব্বনাশ! তাঁদের বন্ধুদের ডেকে বললেন, "আমরা কি এখেনে বড়ো মানুষী করতে এসেছি? আমাদের বাপু বেশি টাকাকড়ি নেই, এরকম ঘরে থাকা আমাদের পোষাবে না!" বন্ধুরা অত্যন্ত আমোদ পেলেন, কারণ তখন তাঁরা একেবারে ভুলে গেছেন যে বহুপূর্ব্বে তাঁদের একদিন এই রকম দশা ঘটেছিল। নবাগতদের নিতান্ত অন্নজীবী বাঙ্গালি মনে ক'রে অত্যন্ত বিজ্ঞতার স্বরে বললেন, "এখানকার সকল ঘরই এই রকম!" নবাগত ভাবলেন, আমাদের দেশে সেই একটা সেঁৎসেঁতে ঘরে একটা তক্তা ও তার উপরে একটা মাদুর পাতা, ইতস্ততঃ হুঁকোর বৈঠক, কোমরে একটুখানি কাপড় জড়িয়ে জুতো জোড়া খুলে দুচার জন মিলে শতরঞ্চ খেলা চলছে, বাড়ির উঠানে একটা গরু বাঁধা, দেয়ালে গোবর দেওয়া, বারান্দা থেকে ভিজে কাপড় শুকচ্চে, ইত্যাদি। তাঁরা বলেন,—প্রথম প্রথম দিনকতক চৌকিতে বসতে, কৌচে শুতে, টেবিলে খেতে, কার্পেটে বিচরণ করতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হোত। সোফায় অত্যন্ত আড় হয়ে বসতেন, ভয় হোত, পাছে সোফা ময়লা হয়ে যায়, বা তার কোনো প্রকার হানি হয়। মনে হোত, সোফা-গুলো কেবল ঘর সাজাবার জন্যেই রেখে দেওয়া, এগুলো

ব্যবহার করতে দিয়ে মাটি করা কখনোই ঘরের কর্ত্তার অভিপ্রেত হোতে পারে না। ঘরে এসে প্রথম মনের ভাব তো এই, তার পরে আর একটি প্রধান কথা বলা বাকি।

বিলেতে ছোটোখাটো বাড়িতে "বাড়িওয়ালা" ব'লে একটা জীবের অস্তিত্ব আছে হয়তো, কিন্তু যাঁরা বাড়িতে থাকেন, "বাড়ীওয়ালী"র সঙ্গেই তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক। ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া, কোনো প্রকার বোঝা পড়া, আহারাদির বন্দোবস্ত করা, সে সমস্তই বাড়িওয়ালীর কাছে। আমার বন্ধুরা যখন প্রথম পদার্পণ করলেন, দেখলেন, এক ইংরেজনী এসে অতি বিনীত স্বরে তাঁদের "সুপ্রভাত" অভিবাদন করলে, তাঁরা নিতান্ত শশব্যস্ত হয়ে ভদ্রতার যথাযোগ্য প্রতিদান দিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন, তাঁদের অন্যান্য ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুগণ তার সঙ্গে অতি অসঙ্কুচিত স্বরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ ক'রে দিলেন, তখন আর-তাঁদের বিস্ময়ের আদি অন্ত রইল না। মনে করো এক সজীব বিবিসাহেব জুতো-পরা, টুপি-পরা, গাউন-পরা! তখন ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুদের উপর সেই নবাগত বঙ্গ-যুবকদের ভক্তির উদয় হোলো, কে'নো কালে যে এই অসমসাহিকদের মতো তাঁদের বুকের পাটা জন্মাবে, তা তাঁদের সম্ভব বোধ হোলো না। যাহোক, এই নবাগতদের যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়ে ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুগণ স্ব স্ব আলয়ে গিয়ে সপ্তাহকাল ধরে তাঁদের অজ্ঞতা নিয়ে অপর্য্যাপ্ত হাস্যকৌতুক করলেন। পূর্ব্বোক্ত গৃহকর্ত্রী প্রত্যহ নবাগতদের অতি বিনীতভাবে, কী চাই কী না চাই, জিজ্ঞাসা করতে আসত। তাঁরা বলেন, এই উপলক্ষ্যে তাঁদের অত্যন্ত আহ্লাদ হোত। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, প্রথম দিন যে দিন তিনি এই ইংরেজ মেয়েকে একটুখানি ধমকাতে পেরেছিলেন, সেদিন সমস্ত দিন তাঁর মন অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল। অথচ সেদিন সূর্য্য

পশ্চিম দিকে ওঠেনি, পর্ব্বত চলাফেরা ক'রে বেড়ায়নি, বহ্নিও শীতলতা প্রাপ্ত হয়নি।

কার্পেট-মোড়া ঘরে তাঁরা সুখে বাস করছেন। তাঁরা বলেন, "আমাদের দেশের নিজের ঘর ব'লে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ ছিল না; যে ঘরে বসতেম, সে ঘরে বাড়ির দশজনে যাতায়াত করছেই। আমি এক পাশে লিখছি, দাদা একপাশে একখানা বই হাতে ক'রে ঢুলছেন, আর-এক দিকে মাদুর পেতে গুরুমশায় ভুলুকে উচ্চৈস্বরে সুর ক'রে ক'রে নামতা পড়াচ্ছেন। এখানে আমার নিজের ঘর; সুবিধামতো ক'রে বইগুলি একদিকে সাজালেম, লেখবার সরঞ্জাম একদিকে গুছিয়ে রাখলেম, কোনো ভয় নেই যে, একদিন পাঁচটা ছেলে মিলে সমস্ত ওলট-পালট করে দেবে, আর একদিন দুটোর সময় কলেজ থেকে এসে দেখব, তিনটে বই পাওয়া যাচ্চে না, অবশেষে অনেক খোঁজ-খোঁজ ক'রে দেখা যাবে বইগুলি নিয়ে আমার ছোটো ভাগ্নীটি তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহচরীদের ডেকে ছবি দেখতে ঘোরতর ব্যস্ত। এখানে নিজের ঘরে বসে থাকো, দরজাটি ভেজানো, সট ক'রে না ব'লে কয়ে কেউ ঘরের মধ্যে এসে পড়ে না, ঘরে ঢোকবার আগে দরজায় শব্দ করে, ছেলেপিলেগুলো চারিদিকে চেঁচামেচি কান্নাকাটি জুড়ে দেয়নি, নিরিবিলি নিরালা, কোনো হাঙ্গামা নেই।" দেশের সম্বন্ধে মেজাজ খিটখিটে হয়ে ওঠে। প্রায় দেখা যায় আমাদের দেশের পুরুষেরা এখানকার পুরুষ-সমাজে বড়ো মিশেন না। কারণ এখানকার পুরুষ-সমাজে মিশতে গেলে এক-রকম বলিষ্ঠ স্ফূর্ত্তির ভাব থাকা চাই, বাধ-বাধ মিঠে সুরে দুচারটে সসঙ্কোচ "হাঁ না" দিয়ে গেলে চলে না। বাঙালি অভ্যাগত ডিনার টেবিলে তাঁর পার্শ্বস্থ মহিলাটির কানে কানে মিষ্টি মিষ্টি টুকরো টুকরো দুই একটি কথা মৃদু ধীরস্বরে কইতে পারেন, আর সে মহিলার সহবাসে তিনি যে

স্বর্গ-সুখ উপভোগ করছেন, তা তাঁর মাথার চুল থেকে বুট জুতোর আগা পর্য্যন্ত প্রকাশ হোতে থাকে, সুতরাং মেয়ে-সমাজে বাঙালিরা পসার করে নিতে পারেন। আমাদের দেশের ঘোমটাচ্ছন্ন-মুখচন্দ্র-শোভী অনালোকিত অন্তঃপুর থেকে এখানকার রূপের মুক্ত জ্যোৎস্নায় এসে আমাদের মন-চকোর প্রাণ খুলে গান গেয়ে ওঠে।

একদিন আমাদের নবাগত বঙ্গ-যুবক তাঁর প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। নিমন্ত্রণ সভায় বিদেশীর অত্যন্ত সমাদর। তিনি গৃহস্বামীর যুবতী কন্যা মিস্ অমুকের বাহু গ্রহণ ক'রে আহারের টেবিলে গিয়ে বসলেন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মুক্তভাবে মিশতে পাইনে, তারপরে নতুন নতুন এসে এখানকার স্ত্রীলোকদের ভাবও ঠিক বুঝতে পারিনে। কোনো সামাজিকতার অনুরোধে তারা আমাদের মনোরঞ্জন করবার জন্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হাস্যালাপ করে, আমরা তার ঠিক মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারিনে, আমরা হঠাৎ মনে করি, আমাদের উপরেই এই মহিলাটির বিশেষ অনুকূল দৃষ্টি। আমাদের বঙ্গ যুবকটি মিস্‌কে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অনেক কথা জানালেন। বললেন, তাঁর বিলেত অত্যন্ত ভালো লাগে, ভারতবর্ষে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না, ভারতবর্ষে অনেক প্রকার কুসংস্কার আছে। শেষকালে দুই একটি সাজানো কথাও বললেন। যথা, তিনি সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে গিয়ে একবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। মিস্‌টি অতি সহজে বুঝতে পারলেন যে, এই যুবকের তাঁকে অতি ভালো লেগেছে। তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলেন, ও তাঁর মিষ্টতম বাক্যবাণ যুবকের প্রাণে হান্‌তে লাগলেন। "আহা, কী গোছালো কথা! কোথায় আমাদের দেশের মেয়েদের মুখের সেই নিতান্ত শ্রমলভ্য দুই একটি 'হাঁ না',—যা এত মৃদু যে, ঘোমটার সীমার মধ্যেই মিলিয়ে যায়; আর কোথায়

এখানকার বিম্বোষ্ঠ-নিঃসৃত অজস্র মধুধারা, যা অযাচিত ভাবে মদিরার মতো শিরায় শিরায় প্রবেশ করে!"

হয়তো বুঝতে পারছ, কী কী মস্‌লার সংযোগে বাঙালি ব'লে একটা পদার্থ ক্রমে ইঙ্গ-বঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়। সমস্ত প্রক্রিয়াটা বিস্তারিত ক'রে লিখতে পারিনি। এত সব ছোটো ছোটো বিষয়ের সমষ্টি মানুষের মনে অলক্ষিত পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে যে, সে সকল খুঁটিনাটি ক'রে বর্ণনা করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।

ইঙ্গ-বঙ্গদের ভালো ক'রে চিন্‌তে গেলে তাঁদের তিন রকম অবস্থায় দেখতে হয়। তাঁরা ইংরেজদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন, বাঙালিদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন ও তাঁদের স্বজাত ইঙ্গ-বঙ্গদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন। একটি ইঙ্গবঙ্গকে একজন ইংরেজের সম্মুখে দেখো, চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। ভদ্রতার ভারে প্রতিকথায় ঘাড় নুয়ে নুয়ে পড়ছে, তর্ক কর্‌বার সময় অতিশয় সাবধানে নরম ক'রে প্রতিবাদ করেন ও প্রতিবাদ করতে হোলো ব'লে অপর্য্যাপ্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, অসংখ্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কথা কন আর না কন, একজন ইংরেজের কাছে একজন ইঙ্গ-বঙ্গ চুপ ক'রে বসে থাকলেও তাঁর প্রতি অঙ্গভঙ্গী, প্রতি মুখের ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হোতে থাকে। কিন্তু তাঁকেই আবার তাঁর স্বজাতিমণ্ডলে দেখো, দেখবে তাঁর মেজাজ। বিলেতে যিনি তিন বৎসর আছেন, এক বৎসরের বিলেতবাসীর কাছে তাঁর অত্যন্ত পায়া ভারি। এই "তিন বৎসর" ও "এক বৎসরের" মধ্যে যদি কখনো তর্ক ওঠে, তাহোলে তুমি "তিন বৎসরের" প্রতাপটা একবার দেখতে পাও। তিনি প্রতিকথা এমন ভাবে, এমন স্বরে বলেন যে, যেন সেই কথাগুলি নিয়ে সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বোঝাপড়া হ'য়ে একটা স্থিরসিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। যিনি

প্রতিবাদ করছেন, তাঁকে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন "ভ্রান্ত" কখনো বা মুখের উপর বলেন "মূর্খ।"

সেদিন একজন গল্প করছিলেন, যে তাঁকে আর এক জন বাঙালি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'মশায়ের কী কাজ করা হয়?' এই গল্প শুনবামাত্র আমাদের একজন ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধু নিদারুণ ঘৃণার সঙ্গে ব'লে উঠলেন, "দেখুন দেখি, কী বার্ব্বরস্!" ভাবটা এই যে, যেমন মিথ্যে কথা না বলা, চুরি না করা নীতি-শাস্ত্রের কতকগুলি মূল নিয়ম, তেমনি অন্য মানুষকে তার জীবিকার কথা জিজ্ঞাসা না করাও একটা মূল নিয়মের মধ্যে।

সেদিন এক জায়গায় আমাদের দেশের শ্রাদ্ধের কথা হচ্ছিল, বাপ-মার মৃত্যুর পর আমরা হবিষ্য করি, বেশভূষা করিনে, ইত্যাদি। শুনে একজন ইঙ্গ-বঙ্গ যুবক অধীরভাবে আমাকে ব'লে উঠলেন যে, "আপনি অবিশ্যি, মশায়, এ সকল অনুষ্ঠান ভালো বলেন না।" আমি বললেম "কেন নয়? আমি দেখছি ইংরেজরা যদি আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে হবিষ্যান্ন খেত, আর আমাদের দেশের লোকেরা না খেত, তাহোলে হবিষ্যান্ন খায় না ব'লে আমাদের দেশের লোকের উপর তোমার দ্বিগুণতর ঘৃণা হোত, ও মনে করতে, হবিষ্যান্ন খায় না ব'লেই আমাদের দেশের এত দুর্দ্দশা। তুমি হয়তো জানো, ইংরেজরা এক টেবিলে তেরজন খাওয়া অলক্ষণ মনে করে, তাদের বিশ্বাস, তাহোলে এক বৎসরের মধ্যে তাদের একজনের মৃত্যু হবেই। একজন ইঙ্গবঙ্গ যখন নিমন্ত্রণ করেন, তখন কোনোমতে তেরজন নিমন্ত্রণ করেন না, জিজ্ঞাসা করলে বলেন, "আমি নিজে বিশ্বাস করিনে, কিন্তু যাঁদের নিমন্ত্রণ করি তাঁরা পাছে ভয় পান তাই বাধ্য হয়ে এ নিয়ম পালন করতে হয়।" সেদিন একজন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর একটি আত্মীয় বালককে রবিবার দিনে রাস্তায় খেলা করতে যেতে

বারণ করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করাতে বল্‌লেন, "রাস্তার লোকেরা কী মনে করবে?"

কতকগুলি বাঙালি বলেন, "এখানকার মতো ঘর ভাড়া দেবার প্রথা তাঁরা আমাদের দেশে প্রচলিত করবেন!" তাঁদের সেই একটিমাত্র সাধ। আর একজন বাঙালি, বাংলা সমাজ সংস্কার করতে চান, বিলেতের সমাজে মেয়ে পুরুষে একত্রে নাচাটাই তাঁর চোখে অত্যন্ত ভালো লেগেছে। কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে আমাদের দেশের ও এদেশের মেয়েদের অমিল দেখে তার পরে তিনি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে ছেলেমানুষের মতো খুঁৎখুঁৎ করতে থাকেন। একজন ইঙ্গ-বঙ্গ নালিষ করছিলেন যে, আমাদের দেশের মেয়েরা পিয়নো বাজাতে পারে না, ও এখানকার মতো ভিজিটরদের সঙ্গে দেখা করতে ও ভিজিট প্রত্যর্পণ করতে যায় না। এই রকম ক্রমাগত প্রতি ছোটো-খাটো বিষয় নিয়ে এদেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা ক'রে ক'রে তাঁদের চটাভাব চটনমান যন্ত্রে ব্লড্ হীট্ ছড়িয়ে ওঠে। একজন ইঙ্গ-বঙ্গ তাঁর সমবেদক বন্ধুদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বল্‌ছিলেন যে, যখন তিনি মনে করেন যে, দেশে ফিরে গেলে তাঁকে চারিদিকে ঘিরে মেয়েগুলো প্যান্ প্যান্ ক'রে কাঁদতে আরম্ভ করবে, তখন আর তাঁর দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না! অর্থাৎ তিনি চান, যে তাঁকে দেখবামাত্রেই "ডিয়র ডলি" ব'লে ছুটে এসে তাঁর স্ত্রী তাঁকে আলিঙ্গন ও চুম্বন ক'রে তাঁর কাঁধে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ডিনারের টেবিলে কাঁটা ছুরি উল্টে ধরতে হবে, কি পাল্টে ধরতে হবে তাই জানবার জন্যে তাঁদের "গবেষণা" দেখলে তাঁদের উপর ভক্তির উদয় হয়। কোটের কোন্ ছাঁটটা ফ্যাশান-সঙ্গত, আজকাল নোবিলিটি আঁট প্যাণ্টলুন পরেন কি ঢল্‌কো পরেন, ওয়ালট্‌স্ নাচেন

কি পোলকা মজুর্কা, মাছের পর মাংস খান কি মাংসের পর মাছ, সে বিষয়ে তাঁরা অভ্রান্ত খবর রাখেন। ঐ রকম ছোটো-খাটো বিষয়ে একজন বাঙালি যত দস্তুর বেদস্তুর নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, এমন এ দিশী করে না। তুমি যদি মাছ খাবার সময় ছুরি ব্যবহার করো তবে একজন ইংরেজ তাতে বড়ো আশ্চর্য্য হবেন না, কেননা তিনি জানেন তুমি বিদেশী কিন্তু একজন ইঙ্গ-বঙ্গ সেখানে উপস্থিত থাকলে তাঁর স্মেলিং সল্টের আবশ্যক করবে। তুমি যদি শেরী খাবার গ্ল্যাসে শ্যাম্পেন খাও তবে একজন ইঙ্গ-বঙ্গ তোমার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবেন, যেন তোমার এই অজ্ঞতার জন্যে সমস্ত পৃথিবীর সুখ শান্তি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। সন্ধ্যে বেলায় তুমি যদি মর্ণিঙ কোট পরো, তাহোলে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট হোলে জেলে নির্জ্জন বাসের আজ্ঞা দিতেন। একজন বিলাত-ফেরতা কাউকে মটন দিয়ে রাই দিয়ে খেতে দেখলে বলতেন "তবে কেন মাথা দিয়ে চলো না ?"

আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখেছি যে, বাঙালিরা ইংরেজদের কাছে স্বদেশের লোকদের ও আচার ব্যবহারের যত নিন্দে করেন, এমন একজন ভারতদ্বেষী এ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানও করেন না। তিনি নিজে ইচ্ছে ক'রে কথা পাড়েন ও ভারতবর্ষের নানা প্রকার কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে প্রাণ খুলে হাস্য পরিহাস করেন। তিনি গল্প করেন যে, আমাদের দেশে বল্লভাচার্য্যের দল ব'লে এক রকম বৈষ্ণবের দল আছে, তাদের সমস্ত অনুষ্ঠান সবিস্তারে বর্ণনা করতে থাকেন। সভার লোকদের হাসাবার অভিপ্রায়ে নেটিব নাচ্ গার্লরা কী রকম ক'রে নাচে, অঙ্গভঙ্গী ক'রে তার নকল করেন ও তাই দেখে সকলে হাসলে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর নিতান্ত ইচ্ছে, তাঁকে কেউ ভারতবর্ষীয় দলের

মধ্যে গণ্য না করে। সাহেব-সাজা বাঙালিদের প্রতি পদে ভয়, পাছে তাঁরা বাঙালি ব'লে ধরা পড়েন। একজন বাঙালি একবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর একজন ভারতবর্ষীয় এসে তাঁকে হিন্দুস্থানীতে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করে, তিনি মহা খাপা হয়ে তার উত্তর না দিয়ে চলে যান। তাঁর ইচ্ছে, তাঁকে দেখে কেউ মনে না করতে পারে যে, তিনি হিন্দুস্থানী বোঝেন। একজন ইঙ্গ-বঙ্গ একটি "জাতীয়-সঙ্গীত" রামপ্রসাদী সুরে রচনা করেছেন; এই গানটার একটু অংশ পূর্ব্ব পত্রে লিখেছি, বাকি আর একটুকু মনে পড়েছে, এই জন্য আবার তার উল্লেখ কচ্চি। এ গীত যাঁর রচনা, তিনি রামপ্রসাদের মতো শ্যামার উপাসক নন, তিনি গৌরীভক্ত। এই জন্যে গৌরীকে সম্বোধন ক'রে বলছেন—

"মা, এবার মলে সাহেব হব;
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে, পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব।
শাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব,
(আবার) কালো বদন দেখলে পরে "ডার্কি" বলে মুখ ফেরাব।"

আমি পূর্ব্বেই বিলেতের বাড়িওয়ালি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছি, তারা বাড়ির লোকদের আবশ্যকমতো সেবা করে। অনেক ভাড়াটে থাকলে তারা বা অন্য আত্মীয়েরা তাদের সাহায্য করবার জন্য থাকে। অনেকে সুন্দরী ল্যাণ্ডলেডি দেখে ঘর ভাড়া করেন। বাড়িতে পদার্পণ করেই ল্যাণ্ডলেডির যুবতী কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে নেন, দু তিন দিনের মধ্যে তাঁর একটি আদরের নামকরণ করা হয়, সপ্তাহ অতীত হোলে তার নামে হয়তো একটা কবিতা রচনা ক'রে তাকে উপহার দেন। সেদিন ল্যাণ্ডলেডির মেয়ে তাঁকে এক পেয়ালা চা এনে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, চায়ে কি চিনি দিতে হবে? তিনি হেসে বললেন, "না নেলি, তুমি যখন ছুঁয়ে দিয়েছ, তখন আর চিনি দেবার দরকার দেখছি

নে।” আমি জানি, একজন ইঙ্গ-বঙ্গ তাঁর বাড়ির দাসীদের মেঝদিদি সেজদিদি ব'লে ডাকতেন।

আমি এক জনকে জানি, তিনি তাঁর “মেঝদিদি, সেজদিদি”বর্গকে এত মান্য করে চলতেন যে তাঁর ঘরে বা তাঁর পাশের ঘরে যদি এদের মধ্যে কেউ উপস্থিত থাকত, এবং সে অবস্থায় যদি তাঁর কোনো ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধু গান বা হাস্য পরিহাস করতেন তাহোলে তিনি মহা অপ্রতিভ হয়ে ব'লে উঠতেন “আরে চুপ করো, চুপ করো, মিস্ এমিলি কী মনে করবেন?” আমার মনে আছে, দেশে থাকতে একবার এক ব্যক্তি বিলেত থেকে ফিরে গেলে পর, আমরা তাকে খাওয়াই। খাবার সময় তিনি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, “এই আমি প্রথম খাচ্চি, যে দিন আমার খাবার টেবিলে কোনো লেডি নেই।” একজন ইঙ্গ-বঙ্গ একবার তাঁর কতকগুলি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। খাবার টেবিলে কতকগুলি ল্যাণ্ডলেডি ও দাসী বসে ছিল, তাদের এক জনের ময়লা কাপড় দেখে নিমন্ত্রণকর্ত্তা তাকে কাপড় বদলে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। শুনে সে বললে, “যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে ময়লা কাপড়েও ভালোবাসা যায়।”

এইবার ইঙ্গ-বঙ্গদের একটি গুণের কথা তোমাকে বলছি। এখানে যাঁরা আসেন, অনেকেই কবুল করেন না, যে, তাঁরা বিবাহিত যেহেতু স্বভাবতই যুবতী কুমারী-সমাজে বিবাহিতদের দাম অল্প। অবিবাহিত ব'লে পরিচয় দিলে এখানকার অবিবাহিতদের সঙ্গে মিশে অনেক যথেচ্ছাচার করা যায়, কিন্তু বিবাহিত ব'লে জানলে তোমার অবিবাহিত সঙ্গীরা ও-রকম অনিয়ম করতে দেয় না; সুতরাং অবিবাহিত ব'লে পরিচয় দিলে অনেক লাভ আছে।

অনেক ইঙ্গ-বঙ্গ দেখতে পাবে তাঁরা আমার এই বর্ণনার বহির্গত।

কিন্তু সাধারণতঃ ইঙ্গ-বঙ্গত্বের লক্ষণগুলি আমি যত দূর জানি, তা লিখেছি।

ভারতবর্ষে গিয়ে ইঙ্গ-বঙ্গদের কী রকম অবস্থা হয় সে বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাও নেই, বক্তব্যও নেই। কিন্তু কিছু কাল ভারতবর্ষে থেকে তার পরে ইংলণ্ডে এলে কী রকম ভাব হয় তা আমি অনেকের দেখেছি। তাঁদের ইংলণ্ড আর তেমন ভালো লাগে না; অনেক সময়ে তাঁরা ভেবে পান না, ইংলণ্ড বদ্‌লেছে, কি তাঁরা বদলেছেন। আগে ইংলণ্ডের অতি সামান্য জিনিষ ভালো লাগত; এখন ইংলণ্ডের শীত ইংলণ্ডের বর্ষা তাঁদের ভালো লাগছে না, এখন তাঁরা ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হোলে দুঃখিত হন না। তাঁরা বলেন, আগে তাঁরা ইংলণ্ডের ষ্ট্রবেরি ফল অত্যন্ত ভালো বাসতেন। এমন কি, তাঁরা যত রকম ফল খেয়েছেন, তার মধ্যে ষ্ট্রবেরিই তাঁদের সকলের চেয়ে স্বাদু মনে হোত। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে ষ্ট্রবেরির স্বাদ বদলে গেল না কি। এখন দেখ্‌ছেন তার চেয়ে অনেক দিশি ফল তাঁদের ভালো লাগে। আগে ডেভ্‌নশিয়রের ক্রীম তাঁদের এত ভালো লাগত যে, তার আর কথা নেই, কিন্তু এখন দেখ্‌ছেন আমাদের দেশের ক্ষীর তার চেয়ে ঢের ভালো। তাঁরা ভারতবর্ষে গিয়ে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে সংসারী হয়ে পড়েন, রোজগার করতে আরম্ভ করেন, ভারতবর্ষের মাটিতে তাঁদের শিকড় একরকম ব'সে যায়। মনটা কেমন শিথিল হয়ে আসে, তখন পায়ের উপর পা দিয়ে টানা পাখার বাতাস খেয়ে কোনো প্রকারে দিন কাটিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত থাকেন। বিলেতে আমোদ বিলাস ভোগ করতে গেলেও অনেক উদ্যমের আবশ্যক করে। এখানে এঘর থেকে ওঘরে যেতে হোলে গাড়ির চলন নেই, হাত পা নাড়তে চাড়তে দশটা চাকরের উপর নির্ভর করলে চলে না। গাড়ি ভাড়া অত্যন্ত বেশি, আর চাকরের মাইনে মাসে

সাড়ে তিন টাকা নয়। থিয়েটার দেখতে যাও; সন্ধ্যে বেলা বৃষ্টি পড়ছে, পথে কাদা, একটা ছাতা ঘাড়ে ক'রে মাইল কতক ছুটোছুটি ক'রে তবে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবে। যখন রক্তের তেজ থাকে, তখন এ সকল পেরে ওঠা যায়।

ষষ্ঠ পত্র

আমাদের ব্রাইটনের বাড়িটি সমুদ্রের কাছে একটি নিরালা জায়গায়। এক সার ২০। ২৫টি বাড়ি, বাড়িগুলির নাম মেডিনা ভিলাজ। হঠাৎ মনে হয়েছিল বাগান বাড়ি। এখানে এসে দেখি, "ভিলা"র মধ্যে আমাদের বাড়ির সামনে দু চার হাত জমিতে দু চারটে গাছ পোঁতা আছে। বাড়ির দরজায় একটা লোহার কড়া লাগানো, সেইটেতে ঠক্ ঠক্ করলাম, "আমাদের ল্যাণ্ডলেডি এসে দরজা খুলে দিলে। আমাদের দেশের তুলনায় এখানকার ঘরগুলো লম্বা চৌড়া ও উঁচুতে ঢের ছোটো। চারিদিকে জানালা বন্ধ, একটু বাতাস আসবার জো নেই, কেবল জান্‌লাগুলো সমস্ত কাঁচের ব'লে আলো আসে। শীতের পক্ষে এরকম ছোটো খাটো ঘরগুলো ভালো, একটু আগুন জ্বাললেই সমস্ত বেশ গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু তা হোক্, যে দিন মেঘে চারিদিক অন্ধকার, টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, তিন চারদিন ধরে মেঘ

বৃষ্টি অন্ধকারের এক মুহূর্ত্ত বিরাম নেই, সে দিন এই ছোট্ট অন্ধকার ঘরটার এক কোণে ব'সে আমার মনটা অত্যন্ত বিগড়ে যায়, কোনো মতে সময় কাটে না। খালি আমি ব'লে নয়, আমার ইংরেজ আলাপীরা বলেন, সে রকম দিনে তাঁদের অত্যন্ত Swear করার প্রবৃত্তি জন্মায়, (Swear করা রোগটা সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়, সুতরাং ওর বাংলা কোনো নাম নেই), মনের ভাবটা অধার্ম্মিক হয়ে ওঠে। যা হোক এখানকার ঘর দুয়ারগুলি বেশ পরিষ্কার ; বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে কোথাও ধূলো দেখবার জো নেই, মেজের সর্ব্বাঙ্গ কার্পেট প্রভৃতি দিয়ে মোড়া, সিঁড়িগুলি পরিষ্কার তক্ তক্ করছে। চোখে দেখতে খারাপ হোলে এরা সইতে পারে না। প্রতি সামান্য বিষয়ে এদের ভালো দেখতে হওয়াটা প্রধান আবশ্যক। শোকবস্ত্রও সুশ্রী দেখতে হওয়া চাই। আমরা যাকে পরিষ্কার বলি সেটা কিন্তু আর একটা জিনিষ। এখানকার লোকেরা খাবার পরে আঁচায় না, কেননা আঁচানো জল মুখ থেকে পড়ছে, সে অতি কুশ্রী দেখায়। শ্রী হানি হয় ব'লে পরিষ্কার হওয়া হয় না। এখানে যে রকম কাশী সর্দ্দির প্রাদুর্ভাব, তাতে ঘরে একটা পিক্‌দানি নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু তার ব্যবহার কুশ্রী ব'লে ঘরে রাখা হয় না, রুমালে সমস্ত কাজ চলে। আমাদের দেশের যে রকম পরিষ্কার ভাব, তাতে আমরা বরঞ্চ ঘরে একটা পিক্‌দানি রাখতে পারি, কিন্তু জামার পকেটে এরকম একটা বীভৎস পদার্থ বহন করতে ঘৃণা হয়। কিন্তু এখানে চোখেরি আধিপত্য। রুমাল কেউ দেখতে পাবে না,তা হোলেই হোলো। চুলটি বেশ পরিষ্কার ক'রে আচড়ানো থাকবে, মুখটি ও হাত দুটি সাফ থাকবে, স্নান করবার বিশেষ দরকার নেই। এখানে জামার উপরে অন্যান্য অনেক কাপড় পরে ব'লে জামার সমস্তটা দেখা যায় না, খালি বুকের ও হাতের কাছে একটু বেরিয়ে থাকে। একরকম জামা

আছে, তার যতটুকু বেরিয়ে থাকে ততটুকু জোড়া দেওয়া, সেটুকু খুলে ধোবার বাড়ি দেওয়া যায়; তাতে সুবিধে হচ্চে যে ময়লা হয়ে গেলে জামা বদলাবার কোনো আবশ্যক করে না, সেই জোড়া টুকরোগুলো বদলালেই হোলো। এখানকার দাসীদের কোমরে এক আঁচল বাঁধা থাকে, সেইটি দিয়ে তারা না পোঁছে এমন পদার্থ নেই; খাবার কাঁচের প্লেট যে দেখ্‌ছ ঝক্ ঝক্ করছে, সেটিও সেই সর্ব্ব-পাবক-আঁচল দিয়ে মোছা হয়েছে, কিন্তু তাতে কী হানি, কিছু খারাপ দেখাচ্চে না। এখানকার লোকেরা অপরিষ্কার নয়, আমাদের দেশে যাকে "নোংরা" বলে তাই। এখানে পরিষ্কার ভাবের যে অভাব আমরা দেখতে পাই, সে অনেকটা শীতের জন্যে। আমরা যে কোনো জিনিষ হোক না কেন, জল দিয়ে পরিষ্কার না হোলে পরিষ্কার মনে করিনে। এখানে অত জল নিয়ে নাড়াচাড়া পোষায় না। তাছাড়া শীতের জন্য এখানকার জিনিষপত্র শীঘ্র "নোংরা" হয়ে ওঠে না। এখানে শীতেও গায়ের আবরণ থাকাতে শরীর তত অপরিষ্কার হয় না। এখানে জিনিষপত্র প'চে ওঠে না, এই রকম পরিষ্কারের পক্ষে নানা বিষয়ে সুবিধে। আমাদের যেমন পরিষ্কার ভাব আছে, তেমনি পরিষ্কার হওয়ার বিষয়ে অনেক ঢিলেমিও আছে। আমাদের দেশের পুষ্করিণীতে কী না ফেলে? অপরিষ্কার জলকুণ্ডে স্নান; তেল মেখে দুটো ডুব দিলেই আমরা শুচিতা কল্পনা করি। আমরা নিজের শরীর ও খাওয়া-দাওয়া সংক্রান্ত জিনিষের বিষয়ে বিশেষ পরিষ্কার থাকি, কিন্তু ঘর দুয়ার যথোচিত পরিষ্কার করিনে। এমন কি অস্বাস্থ্যকর করে তুলি।

আমাদের দুই একটি ক'রে আলাপী হোতে লাগল। ডাক্তার ম— একজন আধবুড়ো চিকিৎসা ব্যবসায়ী। তিনি একজন প্রকৃত ইংরেজ, ইংলণ্ডের বহির্ভূত কোনো জিনিষ তাঁর পছন্দসই নয়। তাঁর কাছে

ক্ষুদ্র ইংলণ্ডই সমস্ত পৃথিবী, তাঁর কল্পনা কখনো ডোভার প্রণালী পার হয় নি। তাঁর কল্পনার এমন অভাব যে, তিনি মনে করতে পারেন না যারা বাইবেলের দশ অনুশাসন মানে না, তাদের মিথ্যে কথা বলতে কী ক'রে সঙ্কোচ হোতে পারে? অখৃষ্ট লোকদের নীতির বিরুদ্ধে এই তাঁর প্রধান যুক্তি। যে ইংরাজ নয়, যে খৃষ্টান নয়, এমন একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখলে তার মনুষ্যত্ব কী ক'রে থাকতে পারে ভেবে পান না। তাঁর মটো হচ্চে Gladly he would learn and gladly teach, কিন্তু আমি দেখলুম তাঁর লর্ণ করবার ঢের আছে, কিন্তু টীচ্ করবার মতো সম্বল বেশি নেই। তাঁর স্বদেশীয় সাহিত্যের বিষয়ে তিনি আশ্চর্য্য কম জানেন; কতকগুলি মাসিক পত্রিকা পড়ে তিনি প্রতি মাসে দুই চারিটি ক'রে ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ করেন। তিনি কল্পনা করতে পারেন না একজন ভারতীয় কী ক'রে এডুকেটেড্ হোতে পারে। এখানকার মেয়েরা শীতকালে হাত গরম রাখবার জন্যে একরকম গোলাকার লোমশ পদার্থের মধ্যে হাত গুঁজে রাখে তাকে মফ্ বলে। প্রথম বিলেতে এসে সেই অপূর্ব্ব পদার্থ যখন দেখি, তখন ডাক্তার ম-কে সে দ্রব্যটা কী জিজ্ঞাসা করি। আমার অজ্ঞতায় তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। এখানকার অনেক লোকের রোগ দেখেছি, তাঁরা আশা করেন, আমরা তাঁদের সমাজের প্রত্যেক ছোটো-খাটো বিষয় জানব। একদিন একটা নাচে গিয়েছিলুম, একজন মেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বধূটিকে (Bride) তোমার কী রকম লাগছে? আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "বধূটি কে?" অতগুলি মেয়ের মধ্যে একজন নববধূ কোথায় আছেন তা আমি জানতুম না। শুনে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, তিনি বললেন "তার মাথায় কমলালেবুর ফুল দেখে চিনতে পারোনি?"

দুই মিস্ ক-র সঙ্গে আলাপ হোলো। তাঁরা এখানকার পাদ্রির মেয়ে। পাড়ায় পরিবারদের দেখাশুনো, রবিবাসরিক স্কুলের বন্দোবস্ত করা, শ্রমিকদের জন্যে টেম্পেরেন্স সভা স্থাপন ও তাঁদের আমোদ দেবার জন্যে সেখানে গিয়ে গান বাজনা করা,—এই সকল কাজে তাঁরা দিন রাত্রি ব্যস্ত আছেন। বিদেশী ব'লে আমাদের তাঁরা অত্যন্ত যত্ন করতেন। নগরে কোথাও আমোদ উৎসব হোলে আমাদের খবর দিতেন, আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেন, অবসর পেলে সকালে কিম্বা সন্ধ্যেবেলায় এসে আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন, ছেলেদের নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে গান শেখাতেন, এক একদিন তাঁদের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে যেতুম। এই রকম আমাদের যথেষ্ট যত্ন ও আদর করতেন। বড়ো মিস ক—অত্যন্ত ভালো মানুষ ও গম্ভীর। একটা কথার উত্তর দিতে কেমন থতমত খেতেন। "হাঁ—না—তা হবে—জানিনে" এই রকম তাঁর উত্তর। এক এক সময় কী বলবেন ভেবে পেতেন না, এক এক সময় একটা কথা বলতে বলতে মাঝখানে থেমে পড়তেন, আর কথা জোগাত না, কোনো বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করলে বিব্রত হয়ে পড়তেন। যদি জিজ্ঞাসা করা যেত, "আজ কি বৃষ্টি হবে মনে হচ্চে?" তিনি বলতেন, "কী ক'রে বলব।" তিনি বুঝতেন না যে অভ্রান্ত বেদবাক্য শুনতে চাচ্চিনে। তিনি আন্দাজ করতে নিতান্ত নারাজ। ছোটো মিস ক-র মতো প্রশান্ত প্রফুল্ল ভাব আর কারো দেখিনি। দেখে মনে হয় কোনো কালে তাঁর মনের কোনোখানে আঁচড় পড়েনি। খুব ভালো মানুষ, সর্ব্বদাই হাসিখুসি গল্প। কাপড়চোপড়ের আড়ম্বর নেই—কোনো প্রকার ভান নেই; অত্যন্ত শাদাসিদে।

ডাক্তার ম-র বাড়িতে একদিন আমাদের সান্ধ্য-নিমন্ত্রণ হোলো। খাওয়াই এখানকার নেমন্তন্নের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। লোকের সঙ্গে আলাপ

পরিচয়, গান বাজনা আমোদ প্রমোদের জন্যই দশজনকে ডাকা। আমরা সন্ধ্যের সময় গিয়ে হাজির হলুম। একটি ছোটো ঘরে অনেকগুলি মহিলা ও পুরুষের সমাগম হয়েছে। ঘরে প্রবেশ ক'রে কর্ত্তা গিন্নিকে আমাদের সম্মান জানালুম। সমাগত লোকদের সঙ্গে যথাযোগ্য অভিবাদন সম্ভাষণ ও আলাপ হোলো। ঘরে জায়গার এত টানাটানি ও লোক এত বেশি যে চৌকির অত্যন্ত অভাব হয়েছিল; অধিকাংশ পুরুষে মিলে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছিলুম। নতুন কোনো অভ্যাগত মহিলা এলে গিন্নি কিম্বা কর্ত্তা তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিচ্চেন, আলাপ হবামাত্র তাঁর পাশে গিয়ে একবার বসছি কিম্বা দাঁড়াচ্চি ও দুই একটা ক'রে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করছি। প্রায় আবহাওয়া নিয়ে কথার আরম্ভ; মহিলাটি বললেন "ড্রেড্‌ফুল্ ওয়েদর।" তাঁর সঙ্গে আমার নিঃসংশয়ে মতের ঐক্য হোলো। তার পরে তিনি অনুমান করলেন যে আমাদের পক্ষে অর্থাৎ ভারতীয়দের পক্ষে এমন ওয়েদর বিশেষ ট্রায়িঙ্, ও আশা করলেন আকাশ শীঘ্র পরিষ্কার হয়ে যাবে, ইত্যাদি। তার পরে এই সূত্রে নানা কথা। সভার মধ্যে দুইজন সুন্দরী উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁরা জানতেন তাঁরা সুন্দরী। এখানে সৌন্দর্য্যের পূজো হয়; এখানে রূপ কোনোমতে আত্মবিস্মৃত থাকতে পারে না, রূপাভিমান সুপ্ত থাকতে পারে না; চারদিক থেকে প্রশংসার কোলাহল তাকে জাগিয়ে তোলে। নাচঘরে রূপসীর দর অত্যন্ত চড়া; নাচে তাঁর সাহচর্য্য-সুখ পাবার জন্যে দরখাস্তের পর দরখাস্ত আসছে; তাঁর তিলমাত্র কাজ ক'রে দেবার জন্য বহুলোক প্রস্তুত। রূপবান পুরুষদেরও যথোচিত আদর আছে। তারা এখানকার ড্রয়িঙরুমের ডার্লিঙ। আমি দেখছি, একথা শুনে তোমার এখানে আসতে লোভ হবে।

তোমার মতো সুপুরুষ এখানকার মতো রূপমুগ্ধ দেশে এলে চতুর্দ্দিকে উঠবে

"..... ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু, অশ্রুবারি ধারা
আসার, জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব—"

যা হোক্ নিমন্ত্রণ সভায় Miss H-দ্বয় রূপসীশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা দুজনেই কেমন চুপচাপ গম্ভীর। বড়ো যে মেশামেশি হাসিখুসি তা ছিল না। ছোটো মিস্ একটা কৌচে গিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন, আর বড়ো মিস্ দেয়ালের কাছে এক চৌকি অধিকার করলেন। আমরা দুই একজনে তাঁদের আমোদে রাখবার জন্যে নিযুক্ত হলুম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কথোপকথনশাস্ত্রে বিচক্ষণ নই, এখানে যাকে উজ্জ্বল বলে তা নই। গৃহকর্ত্তা একজন সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞতাভিমানিনী প্রৌঢ়া মহিলাকে বাজাতে অনুরোধের জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। গৃহের মহিলাদের মধ্যে তাঁর বয়স সব চেয়ে বেশি; তিনি সব চেয়ে বেশি সাজগোজ ক'রে এসেছিলেন, তাঁর দুহাতের দশ আঙুলে যতগুলো ধরে তত আংটি ছিল। আমি যদি নিমন্ত্রণকর্ত্তা হতুম তাহোলে তাঁর আঙটির বাহুল্য দেখেই বুঝতে পারতুম যে তিনি পিয়নো বাজাবেন ব'লে বাড়ি থেকে স্থিরসংকল্প হয়ে এসেছেন। তাঁর বাজনা সাঙ্গ হোলে পর গৃহকর্ত্রী আমাকে গান গাবার জন্যে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন। আমি বড়ো মুস্কিলে পড়লুম। আমি জানতুম, আমাদের দেশের গানের উপর যে তাঁদের বড়ো অনুরাগ আছে তা নয়। ভালোমানুষ হবার বিপদ এই যে নিজেকে হাস্যকরতা থেকে বাঁচানো যায় না। তাই মিষ্টার টি—গান গাওয়ার ভূমিকা স্বরূপ দুই একটি আরম্ভ-সূচক কাশি-ধ্বনি করলেন।

সভা শান্ত হোলো। কোনো প্রকারে কর্ত্তব্য পালন করলুম। সভাস্থ মহিলাদের এত হাসি পেয়েছিল, যে, ভদ্রতার বাঁধ টল্‌মল্ করছিল; কেউ কেউ হাসিকে কাশির রূপান্তরে পরিণত করলেন, কেউ কেউ হাত থেকে কী যেন পড়ে গেছে ভান ক'রে ঘাড় নিচু ক'রে হাসি লুকোতে চেষ্টা করলেন, একজন কোনো উপায় না দেখে তাঁর পার্শ্বস্থ সহচরীর পিঠের পিছনে মুখ লুকলেন; যাঁরা কতকটা শান্ত থাকতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চোখে চোখে টেলিগ্রাফ চলছিল। সেই সঙ্গীত-শাস্ত্র বিশারদ প্রৌঢ়াটির মুখে এমন একটু মৃদু তাচ্ছিল্যের হাসি লেগে ছিল যে, সে দেখে শরীরের রক্ত জল হয়ে আসে। গান যখন সাঙ্গ হোলো তখন আমার মুখ কান লাল হয়ে উঠেছে, চারদিক থেকে একটা প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি উঠল, কিন্তু অত হাসির পর আমি সেটাকে কানে তুললুম না। ছোটো মিস্ হ—আমাকে গানটা ইংরেজিতে অনুবাদ করতে অনুরোধ করলেন, আমি অনুবাদ করলেম। গানটা হচ্চে "প্রেমের কথা আর বোলো না।" তিনি অনুবাদটা শুনে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের দেশে প্রেমের স্বাধীনতা আছে নাকি। কতকগুলি রোমের ভগ্নাবশেষের ফোটোগ্রাফ ছিল, সেইগুলি নিয়ে গৃহকর্ত্রী কয়েকজন অভ্যাগতকে জড়ো ক'রে দেখাতে লাগলেন। ডাক্তার ম—একটা টেলিফোন্ কিনে এনেছেন, সেইটি নিয়ে তিনি কতকগুলি লোকের কৌতূহল তৃপ্ত করছেন। পাশের ঘরে টেবিলে খাবার সাজানো। এক একবার গৃহকর্ত্তা এসে এক একজন পুরুষের কানে কানে ব'লে যাচ্চেন, মিস্ অথবা মিসেস অমুককে নিশিভোজনে নিয়ে যাও; তিনি গিয়ে সেই মহিলার কাছে তাঁকে খাবার ঘরে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করছেন ও তাঁর বাহুগ্রহণ ক'রে তাঁকে পাশের ঘরে আহারস্থলে নিয়ে যাচ্চেন। এরকম সভায় সকলে মিলে একেবারে

খেতে যায় না, তার কারণ তাহোলে আমোদ প্রমোদের স্রোত অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়। এই রকম এক সঙ্গে পুরুষ মহিলা সকলে মিলে গান বাজনা গল্প আমোদপ্রমোদ আহারাদিতে একটা সন্ধ্যা কাটানো গেল।

এখানে মিলনের উপলক্ষ্য কত প্রকার আছে, তার সংখ্যা নেই। ডিনার, বল্, conversazione, চা-সভা, lawn parties, excursions, picnic, ইত্যাদি। Thackeray বলেন, "English Society has this eminent advantage over all others—that is if there be any society left in the wretched distracted old European continent—that it is above all others a dinner-giving society." অবসর পেলে এক সন্ধ্যে বন্ধু বান্ধবদের জড় ক'রে আহারাদি করা ও আমোদ প্রমোদ ক'রে কাটানো এখানকার পরিবারের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে। ডিনর সভার বর্ণনা করতে বসা বাহুল্য। ডাক্তার ম র বাড়িতে যে পার্টির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে ডিনর-পার্টির প্রভেদ কেবল দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে (এ ম্লেচ্ছদের দেশে ভক্ষণটা আবার দক্ষিণ বাম উভয় হস্তের ব্যাপার)। আমি একবার এখানকার একটি বোট-যাত্রা ও পিক্‌নিক পার্টিতে ছিলুম। এখানকার একটি রবিবারিক সভার সভ্যেরা এই বোটযাত্রার উদ্‌যোগী। এই সভার সভ্য এবং সভ্যারা রবিবার পালনের বিরোধী। তাই তাঁরা রবিবারে একত্র হয়ে নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করেন। এই রবিবারিক সভার সভ্য আমাদের এক বাঙালি মিত্র ম—মহাশয় আমাদের অনুগ্রহ ক'রে টিকিট দেন। লণ্ডন থেকে রেলোয়ে ক'রে টেম্‌সের ধারে এক গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলুম। গিয়ে দেখলুম টেম্‌সে একটা প্রকাণ্ড নৌকো বাঁধা, আর প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন রবিবার-বিদ্রোহী মেয়ে পুরুষে একত্র

হয়েছেন। দিনটা অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর যাঁদের যাঁদের আসবার কথা ছিল, তাঁরা সকলে আসেন নি। আমার নিজের এ পার্টিতে যোগ দেবার ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু ম—মহাশয় নাছোড়-বান্দা। আমরা অনেক ভারতবর্ষীয় একত্র হয়েছিলুম, বোধ হয় ম-মহাশয় সকলকেই সুন্দরীর লোভ দেখিয়েছিলেন, কেননা সকলেই প্রায় বাহারে সাজগোজ ক'রে গিয়েছিলেন। অনেকেই গলায় লাল ফাঁসি বেঁধেছিলেন। ম—মহাশয় স্বয়ং তাঁর নেক্-টাইয়ে একটি তলবারের আকারের পিন গুঁজে এসেছিলেন। আমাদের মধ্যে একজন তাঁকে ঠাট্টা ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেশের সমস্ত টাইয়ে যে তলবারেব আঘাত করা হয়েছে, ওটা কি তার বাহ্য লক্ষণ?" তিনি হেসে বললেন "তা নয় গো, বুকের কাছে একটা কটাক্ষের ছুরি বিঁধেছে, ওটা তারি চিহ্ন।" দেশে থাকতে বিঁধেছিল, কি এখানে, তা কিছু বললেন না। ম—মহাশয়ের হাসি তামাসার বিরাম নেই; সেদিন তিনি ষ্টীমারের সমস্ত লোকের সঙ্গে সমস্ত দিন ঠাট্টা ও গল্প ক'রে কাটিয়েছিলেন। একবার তিনি মহিলাদের হাত দেখে গুণতে আরম্ভ করলেন। তখন তিনি বোটসুদ্ধ মেয়েদের এত প্রচুর পরিমাণে হাসিয়েছিলেন, যে, সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর উপর আমার মনে মনে একটুখানি ঈর্ষার উদ্রেক হয়েছিল। যথাসময়ে বোট ছেড়ে দিল। নদী এত ছোটো যে, আমাদের দেশের খালের কাছাকাছি পৌঁছয়। ষ্টীমারের মধ্যে আমাদের আলাপ পরিচয় গল্প স্বল্প চলতে লাগল। একজন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের একজন দিশি লোকের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্ক উঠল। আমাদের সঙ্গে একজনের আলাপ হোলো, তিনি তাঁদের ইংরেজি সাহিত্যের কথা তুললেন; তাঁর শেলির কবিতা অত্যন্ত ভালো লাগে; সে বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হোলো দেখে তিনি ভারী খুসী হলেন;

তিনি আমাকে বিশেষ ক'রে তাঁর বাড়ি যেতে অনুরোধ করলেন। ইনি ইংরেজি সাহিত্য ও তাঁর নিজের দেশের রাজনীতি ভালো রকম ক'রে চর্চ্চা করেছেন, কিন্তু যেই ভারতবর্ষের কথা উঠল, অমনি তাঁর অজ্ঞতা বেরিয়ে পড়ল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন রাজার অধীনে।" আমি অবাক হয়ে বললুম—"ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের।" তিনি বললেন, "তা আমি জানি, কিন্তু আমি বলছি, কোন ভারতবর্ষীয় রাজার অব্যবহিত অধীনে!" কলকাতার বিষয়ে এঁর জ্ঞান এই রকম। তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আমার অজ্ঞতা মাপ করবেন; ভারতবর্ষের বিষয়ে আমাদের ঢের জানা উচিত ছিল, কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি আমি এ বিষয়ে খুব কম জানি।" এই রকম বোটের ছাতের উপর আমাদের কথাবার্ত্তা চলতে লাগল; আমাদের মাথার উপরে একটা কানাতের আচ্ছাদন। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি হচ্চে, কানাতের আচ্ছাদনে সেটা কতকটা নিবারণ করছে। যেদিকে বৃষ্টির ছাঁট পৌঁছচ্চে না, সেইদিকে মেয়েদের রেখে আর এক পাশে এসে ছাতা খুলে দাঁড়ালুম। দেখি আমাদের দিশি বন্ধু ক—মহাশয় সেই মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। এই নিয়ে তাঁকে ঠাট্টা করাতে তিনি বার বার ক'রে বললেন যে, বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া ছাড়া তাঁর অন্য অভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাহোক সেদিন আমরা বৃষ্টিতে তিন চার বার ক'রে ভিজেছি। এই রকম ভিজতে ভিজতে গম্যস্থানে গিয়ে পৌঁছলেম। তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু আকাশে মেঘ আছে ও জমি ভিজে। মাঠে নেবে আমাদের খাওয়া দাওয়ার কথা ছিল, আকাশের ভাবগতিক দেখে তা আর হোলো না। আহারের পর আমরা নৌকো থেকে নেবে বেড়াতে বেরোলোম। কোনো কোনো প্রণয়ীযুগল একটি ছোটো নৌকো নিয়ে

দাঁড বেয়ে চললেন, কেউ বা হাতে হাতে ধরে নিরিবিলি কানে কানে কথা কইতে কইতে মাঠে বেড়াতে লাগলেন। আমাদের সঙ্গে একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা তার ফোটোগ্রাফের সরঞ্জাম সঙ্গে ক'রে এনেছিল, আমরা সমস্ত দল মাঠে দাঁড়ালেম, আমাদের ছবি নেওয়া হোলো। সহসা ম—মহাশয়ের খেয়াল গেল যে আমরা যতগুলি কৃষ্ণমূর্ত্তি আছি, একত্রে সকলের ছবি নেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন, তাঁরা এ প্রস্তাবে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, এরকম একটা ইন্‌ভীডিয়স্ ডিস্‌টিংশন তাঁদের মনঃপূত নয়; কিন্তু ম—মহাশয় ছাড়বার পাত্র নন। অবশেষে ষ্টীমার লণ্ডন অভিমুখে ছাড়া হোলো। তখন ভগবান মরীচিমালী তাঁহার সহস্র রশ্মি সংযমন পুরঃসর অস্তাচল-চূডাবলম্বী জলধর-পটল-শয়নে বিশ্রান্ত মস্তক বিন্যাসপূর্ব্বক অরুণ-বর্ণ নিদ্রাতুর লোচন মুদ্রিত করিলেন; বিহগকুল স্ব স্ব নীডে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, গাভীবৃন্দ হাম্বারব করিতে করিতে গোপালের অনুবর্ত্তন করিয়া গোষ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। আমরা লণ্ডনের অভিমুখে যাত্রা করলেম।

সপ্তম পত্র

এখানকার ধনী ফ্যাশনেবল মেয়েদের কথা একটু ব'লে নিই। তাঁদের দোরস্ত করতে হোলে দিন দুই আমাদের দিশি শাশুড়ির ও বিধবা ননদের হাতে রাখতে হয়। তাঁরা হচ্ছেন বড়ো মানুষের মেয়ে কিম্বা বড়ো মানুষের স্ত্রী। তাঁদের চাকর আছে, কাজ কর্ম্ম করতে হয় না, একজন হৌস্-কীপর আছে, সে বাড়ির সমস্ত ঘরকন্না তদারক করে,

একজন নর্স আছে, সে ছেলেদের মানুষ করে, একজন গভর্ণেস্ আছেন তিনি ছেলেপিলেদের পড়াশুনো দেখেন ও অন্যান্য নানাবিধ বিষয়ে তদারক করেন ; তবে আর পরিশ্রম করার কী রইল বলো। কেবল একটা বাকি আছে, সেটা হচ্চে সাজসজ্জা ; কিন্তু তার জন্য তাঁর লেডীজ্ মেড্ আছে, সুতরাং সেটাও সমস্তটা নিজের হাতে করতে হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত দিনটা তাঁর হাতে আস্ত পড়ে থাকে। সকাল বেলায় বিছানায় প'ড়ে, দরজা জানালা বন্ধ ক'রে সূর্য্যের আলোক আসতে না দিয়ে দিনটাকে কতকটা সংক্ষেপ করেন, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাষ্ট্ খান ও এগারোটার আগে শয়ন-গৃহ থেকে বেরোলে যথেষ্ট ভোরে উঠেছেন মনে করেন। তার পরে সাজসজ্জা ; সে বিষয়ে তোমাকে কোনো প্রকার খবর দিতে পারছিনে। শোনা যায় খুব সম্প্রতি বিলেতে স্নানটা ফ্যাশন হয়েছে কিন্তু এখনো এটা খুব কম দূর ব্যাপ্ত। সিমন্তিনীরা হাতের যতটুকু বেরিয়ে থাকে—মুখটি ও গলাটি—দিনের মধ্যে অনেকবার অতি যত্নে ধুয়ে থাকেন ; বাকি অঙ্গ পরিষ্কার করবার তাঁরা তত আবশ্যক দেখেন না, কেননা মনোহরণের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোনো প্রকার মরচে না পড়লেই হোলো। মাসে দুবার একটা স্পঞ্জবাথ্ নিলেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন। আমি কোনো ইংরেজ পরিবারের মধ্যে বাস করতে গিয়েছিলেম, আমি স্নান করি শুনে তাঁরা বিপন্ন হয়েছিলেন। কোনো প্রকার স্নানের সরঞ্জাম ছিল না, সেজন্যে অগভীর একটা গোল জলাধার ধার ক'রে আনতে হয়েছিল। বাড়িতে লোক দেখা করতে এলে তাদের সঙ্গে আলাপাচারি করা গৃহিণীর কাজ, অনেক লোক একসঙ্গে এলে তাঁর কর্ত্তব্য হচ্চে—তাঁর বাক্য ও হাসির অমৃত সকলকে সমানভাবে বিতরণ করা, বিশেষ কারো সঙ্গে বেশি কথা কওয়া বা বিশেষ কাউকে বেশি যত্ন করাটা উচিত নয়। এ কাজটা অত্যন্ত দুরূহ, বোধ হয় অনেক

অভ্যেসে দুরস্ত হয়। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি তাঁরা একজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা কন, তার পরে শেষ করেই সকলের দিকে চেয়ে একবার হাসেন, কখনো বা তাঁরা একজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা আরম্ভ করেন, তার পর বলতে বলতে এক একবার ক'রে সকলের মুখের দিকে চেয়ে নেন, কখনো বা, তাস খেলবার সময় যে রকম ক'রে চট্‌পট্ তাস বিতরণ করে, তেমনি তাঁরা আগন্তুকদের একে একে ক'রে একটি একটি কথার টুকরো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেন, এমন তাড়াতাড়ি ও এমন দক্ষতার সঙ্গে যে, তাঁদের হাতে যে অনেক কথার তাস গোছানো রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। একজনকে বললেন, "Lovely morning, isn't it?" তার পরেই তাড়াতাড়ি আর একজনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "কাল রাত্তিরে সঙ্গীতশালায় মাডাম্ নীলসন গান করেছিলেন, it was exquisite!" যতগুলি মহিলা ভিজিটর বসেছিলেন সকলে ঐ কথায় এক একটা বিশেষণ যোগ করতে লাগলেন; একজন বললেন "Charming," একজন বললেন "Superb," একজন বললেন "Something unearthly," আর একজন বাকী ছিলেন, তিনি বললেন "Isn't it?" আমার বোধ হয়, এ এক রকম সকালবেলা উঠে কথোপকথনের মুগুর ভাঁজা। যাহোক এই রকম মাঝে মাঝে ভিজিটর আনাগোনা করছে। মূডীজ লাইব্রেরিতে তিনি চাঁদা দিয়ে থাকেন। সেখান থেকে অনবরত ক্ষণজীবী নভেলগুলো তাঁর ওখেনে যাতায়াত করে। সেগুলো অনবরত গলাধঃকরণ করেন। তাছাড়া আছে ভালোবাসার অভিনয়। মিষ্টি হাসি ও মিষ্টি কথার আদান প্রদান, অলীক ছুঁতো নিয়ে একটু অলীক অভিমান, হয়তো পুরুষপক্ষ থেকে একটু রসিকতা,অপর পক্ষে উদ্যত ক্ষুদ্র-মুষ্টি সহযোগে সুমধুর লাঞ্ছনা, "Oh, you naughty, wicked, provoking man!" তাতে naughty

একজন নর্স আছে, সে ছেলেদের মানুষ করে, একজন গভর্ণেস্ আছেন তিনি ছেলেপিলেদের পড়াশুনো দেখেন ও অন্যান্য নানাবিধ বিষয়ে তদারক করেন ; তবে আর পরিশ্রম করার কী রইল বলো। কেবল একটা বাকি আছে, সেটা হচ্চে সাজসজ্জা ; কিন্তু তার জন্য তাঁর লেডীজ্ মেড্ আছে, সুতরাং সেটাও সমস্তটা নিজের হাতে করতে হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত দিনটা তাঁর হাতে আস্ত পড়ে থাকে। সকাল বেলায় বিছানায় প'ড়ে, দরজা জানালা বন্ধ ক'রে সূর্য্যের আলোক আসতে না দিয়ে দিনটাকে কতকটা সংক্ষেপ করেন, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাষ্ট্ খান ও এগারোটার আগে শয়ন-গৃহ থেকে বেরোলে যথেষ্ট ভোরে উঠেছেন মনে করেন। তার পরে সাজসজ্জা ; সে বিষয়ে তোমাকে কোনো প্রকার খবর দিতে পারছিনে। শোনা যায় খুব সম্প্রতি বিলেতে স্নানটা ফ্যাশন হয়েছে কিন্তু এখনো এটা খুব কম দূর ব্যাপ্ত। সিমস্তিনীরা হাতের যতটুকু বেরিয়ে থাকে—মুখটি ও গলাটি—দিনের মধ্যে অনেকবার অতি যত্নে ধুয়ে থাকেন ; বাকি অঙ্গ পরিষ্কার করবার তাঁরা তত আবশ্যক দেখেন না, কেননা মনোহরণের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোনো প্রকার মরচে না পড়লেই হোলো। মাসে দুবার একটা স্পঞ্জবাথ্ নিলেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন। আমি কোনো ইংরেজ পরিবারের মধ্যে বাস করতে গিয়েছিলেম, আমি স্নান করি শুনে তাঁরা বিপন্ন হয়েছিলেন। কোনো প্রকার স্নানের সরঞ্জাম ছিল না, সেজন্যে অগভীর একটা গোল জলাধার ধার ক'রে আনতে হয়েছিল। বাড়িতে লোক দেখা করতে এলে তাদের সঙ্গে আলাপাচারি করা গৃহিণীর কাজ, অনেক লোক একসঙ্গে এলে তাঁর কর্ত্তব্য হচ্চে—তাঁর বাক্য ও হাসির অমৃত সকলকে সমানভাবে বিতরণ করা, বিশেষ কারো সঙ্গে বেশি কথা কওয়া বা বিশেষ কাউকে বেশি যত্ন করাটা উচিত নয়। এ কাজটা অত্যন্ত দুরূহ, বোধ হয় অনেক

অভ্যেসে দুরস্ত হয়। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি তাঁরা একজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা কন, তার পরে শেষ করেই সকলের দিকে চেয়ে একবার হাসেন, কখনো বা তাঁরা একজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা আরম্ভ করেন, তার পর বলতে বলতে এক একবার ক'রে সকলের মুখের দিকে চেয়ে নেন, কখনো বা, তাস খেলবার সময় যে রকম ক'রে চট্‌পট্ তাস বিতরণ করে, তেমনি তাঁরা আগন্তুকদের একে একে ক'রে একটি একটি কথার টুকরো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেন, এমন তাড়াতাড়ি ও এমন দক্ষতার সঙ্গে যে, তাঁদের হাতে যে অনেক কথার তাস গোছানো রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। একজনকে বললেন, "Lovely morning, isn't it?" তার পরেই তাড়াতাড়ি আর একজনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "কাল রাত্তিরে সঙ্গীতশালায় মাডাম্ নীলসন গান করেছিলেন, it was exquisite!" যতগুলি মহিলা ভিজিটর বসেছিলেন সকলে ঐ কথায় এক একটা বিশেষণ যোগ করতে লাগলেন; একজন বললেন "Charming," একজন বললেন "Superb," একজন বললেন "Something unearthly," আর একজন বাকী ছিলেন, তিনি বললেন "Isn't it?" আমার বোধ হয়, এ এক রকম সকালবেলা উঠে কথোপকথনের মুগুর ভাঁজা। যাহোক এই রকম মাঝে মাঝে ভিজিটর আনাগোনা করছে। মূডীজ লাইব্রেরিতে তিনি চাঁদা দিয়ে থাকেন। সেখান থেকে অনবরত ক্ষণজীবী নভেলগুলো তাঁর ওখেনে যাতায়াত করে। সেগুলো অনবরত গলাধঃকরণ করেন। তাছাড়া আছে ভালোবাসার অভিনয়। মিষ্টি হাসি ও মিষ্টি কথার আদান প্রদান, অলীক ছুঁতো নিয়ে একটু অলীক অভিমান, হয়তো পুরুষপক্ষ থেকে একটু রসিকতা,অপর পক্ষে উদ্যত ক্ষুদ্র-মুষ্টি সহযোগে সুমধুর লাঞ্ছনা, "Oh, you naughty, wicked, provoking man!" তাতে naughty

man এর পরিপূর্ণ তৃপ্তি। এই রকম ভিজিটর অভ্যর্থনা, ভিজিট প্রত্যর্পণ, নতুন নভেল পড়া, নতুন ফ্যাশন সৃষ্টি ও নতুন ফ্যাশনের অনুবর্ত্তন করা, এবং তার সঙ্গে মধুর রস যোগ ক'রে ফ্লর্ট এবং হয়তো লভ্ করা তাঁদের দিনকৃত্য। আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্যে প্রস্তুত করে, যথেষ্ট লেখা পড়া শেখায় না, কেননা মেয়েদের আপিসে যেতে হবে না; এখেনেও তেমনি মার্ঘি দরে বিকবার জন্য মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে পালিশ করতে থাকে, বিয়ের জন্যে যতটুকু লেখাপড়া শেখা দরকার ততটুকু যথেষ্ট। একটু গান গাওয়া, একটু পিয়নো বাজানো, ভালো ক'রে নাচা, খানিকটা ফরাসি ভাষা বিকৃত উচ্চারণ, একটু বোনা ও শেলাই করা জানলে একটি মেয়েকে বিয়ের দোকানের জানলায় সাজিয়ে রাখবার উপযুক্ত বংচঙে পুতুল গড়ে তোলা যায়। এবিষয়ে একটা দিশি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যতটুকু তফাৎ, আমাদের দেশের ও এদেশের মেয়েদের মধ্যে ততটুকু তফাৎ মাত্র। আমাদের দিশি মেয়েদের পিয়নো ও অন্যান্য টুকিটাকি শেখবার দরকার করে না, বিলিতি মেয়েদেরও অল্প স্বল্প লেখাপড়া শিখতে হয়, কিন্তু দুইই দোকানে বিক্রি হবার জন্যে তৈরি। এখানেও পুরুষেরাই হর্ত্তা কর্ত্তা, স্ত্রীরা তাদের অনুগতা; স্ত্রীকে আদেশ করা, স্ত্রীর মনে লাগাম লাগিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট অধিকার মনে করেন। ফ্যাশনী মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরো অনেক রকম মেয়ে আছে, নইলে সংসার চলত না। মধ্যবিৎ গৃহস্থ মেয়েদের অনেকটা মেহন্নত করতে হয়, বাবুয়ানা করলে চলে না। সকালে উঠে একবার রান্নাঘর তদারক করতে হয়, সে ঘর পরিষ্কার আছে কি না, জিনিষপত্র যথা-পরিমিত আনা হয়েছে কিনা, যথাস্থানে রাখা হয়েছে কি না, ইত্যাদি

দেখাশুনা করা; রান্না ও খাবার জিনিষ আনতে হুকুম দেওয়া, পয়সা বাঁচাবার জন্য নানাপ্রকার গিন্নিপনার চাতুরী খেলা, কালকের মাংসের হাড়গোড় কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে তাহোলে বন্দোবস্ত ক'রে তার থেকে আজকের সুপ চালিয়ে নেওয়া, পরশু দিনকার বাসি রাঁধা মাংস যদি খাওয়া দাওয়ার পর খানিকটা বাকি থাকে তাহোলে সেটাকে রূপান্তরিত ক'রে আজকের টেবিলে আনবার সুবিধে ক'রে দেওয়া, এই রকম নানাপ্রকার গৃহিণীপনা। তারপর ছেলেদের জন্য মোজা কাপড়চোপড়, এমন কি নিজেরও অনেক কাপড় নিজে তৈরি করেন। এদের সকলের ভাগ্যে নভেল পড়া ঘটে ওঠে না; বড়ো জোর খবরের কাগজ পড়েন, তাও সকলে পড়েন না দেখেছি; অনেকের পড়াশুনার মধ্যে কেবল চিঠি পড়া ও চিঠি লেখা, দোকানদারদের বিল পড়া ও হিসাব লেখা। তাঁরা বলেন, "পলিটিক্‌স্ এবং অন্যান্য গ্রাম্যারি বিষয় নিয়ে পুরুষরা নাড়াচাড়া করুন; আমাদের কর্ত্তব্য কাজ স্বতন্ত্র।" দুর্ব্বলতা মেয়েদের একটা গর্ব্বের বিষয়; সুতরাং অনেক মেয়ে শ্রান্ত না হোলেও এলিয়ে পড়েন। বুদ্ধি বিদ্যার বিষয়েও এই রকম; মেয়েরা জাঁক করে বলেন, "আমরা বাপু, ওসব বুঝি সুঝিনে।" বিদ্যার অভাব, বুদ্ধির খর্ব্বতা একটা প্রকাশ্য জাঁকের বিষয় হয়ে ওঠে। এখানকার মধ্যবিৎ শ্রেণীর মেয়েরা বিদ্যাচর্চ্চার দিকে ততটা মনোযোগ দেন না, তাঁদের স্বামীরাও তার জন্য বড়ো দুঃখিত নন, তাঁদের জীবন হচ্চে কতকগুলি ছোটোখাটো কাজের সমষ্টি। সন্ধ্যেবেলায় স্বামী কর্ম্মক্ষেত্র থেকে এলে একটি আদরের চুম্বন উপার্জ্জন করেন, (পরিবার বিশেষে যে তার অন্যথা হয় তা বলাই বাহুল্য) ঘরে তাঁর জন্যে আগুন জ্বালানো, খাবার সাজানো আছে। সন্ধ্যেবেলায় স্ত্রী হয়তো একটা সেলাই নিয়ে বসলেন, স্বামী তাঁকে একটি নভেল চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতে লাগলেন,

সুমুখে আগুন জ্বলছে, ঘরটি বেশ গরম, বাইরে পড়ছে বৃষ্টি, জানালা দরজাগুলি বন্ধ। হয়তো স্ত্রী পিয়নো বাজিয়ে স্বামীকে খানিকটা গান শোনালেন। এখানকার মধ্যবিৎ শ্রেণীর গিন্নিরা সাদাসিধে। যদিও তাঁরা ভালো করে লেখাপড়া শেখেননি, তবু তাঁরা অনেক বিষয় জানেন, এবং তাঁদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিষ্কার। এদেশে কথায় বার্ত্তায় জ্ঞানলাভ করা যায়, তাঁরা অন্তঃপুরে বদ্ধ নন, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আলাপ করেন, আত্মীয় সভায় একটা কোনো উচ্চ বিষয় নিয়ে চর্চ্চা হোলে তাঁরা শোনেন ও নিজের বক্তব্য বলতে পারেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একটা বিষয়ের কতদিক দেখেন ও কী রকম চক্ষে দেখেন, তা বুঝতে পারেন। সুতরাং একটা কথা উঠলে, কতকগুলো ছেলেমানুষী আকাশ-থেকে-পড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না ও তাঁকে হাঁ করে থাকতে হয় না। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে খুব সহজভাবে গল্পস্বল্প করতে পারেন, নিমন্ত্রণ সভায় মুখ ভার করে বা লজ্জায় অবসন্ন হয়ে থাকেন না, পরিচিতদের সঙ্গে অন্যায় ঘেঁসাঘেঁসি নেই, কিম্বা তাদের কাছ থেকে নিতান্ত অসামাজিক ভাবে দূরেও থাকেন না। লোক-সমাজে মুখটি খুব হাসিখুসি, প্রসন্ন; যদিও নিজে খুব রসিকা নন, কিন্তু হাসি তামাসা বেশ উপভোগ করতে পারেন, একটা কিছু ভালো লাগলে মন খুলে প্রশংসা করেন, একটা কিছু মজার কথা শুনলে প্রাণ খুলে হাস্য করেন।

আমি দিন কতক আমার শিক্ষকের পরিবারের মধ্যে বাস করেছিলুম। সে বড়ো অদ্ভুত পরিবার। মিষ্টার ব—মধ্যবিত্ত লোক। তিনি লাটিন ও গ্রীক খুব ভালো রকম জানেন। তাঁর ছেলে পিলে কেউ নেই,—তিনি, তাঁর স্ত্রী, আমি, আর একজন দাসী এই চার জন মাত্র একটি বাড়িতে থাকতুম। কর্ত্তা আধবুড়ো লোক, অত্যন্ত অন্ধকার মূর্ত্তি, দিন রাত খুঁৎ-খুঁৎ খিটখিট করেন, নিচের তলায় রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট্ট

জানালাওয়ালা দরজা বন্ধ অন্ধকার ঘরে থাকেন। একে তো সূর্য্যকিরণ সে ঘরে সহজেই প্রবেশ করতে পারে না, তাতে জানালার উপরে একটা পর্দ্দা ফেলা, চারদিকে পুরোনো ছেঁড়া ধূলোমাখা নানাপ্রকার আকারের ভীষণদর্শন গ্রীক লাটিন বইয়ে দেয়াল ঢাকা, ঘরে প্রবেশ করলে এক রকম বদ্ধ হাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠতে হয়। এই ঘরটা হচ্চে তাঁর ষ্টাডি এইখানে তিনি পড়েন ও পড়ান। তাঁর মুখ সর্ব্বদাই বিরক্ত, আঁট বুট জুতো পরতে বিলম্ব হচ্চে, বুট জুতোর উপর চটে ওঠেন; যেতে যেতে দেয়ালের পেরেকে তাঁর পকেট আট্‌কে যায়, রেগে ভুরু কুঁকড়ে ঠোঁট নাড়তে থাকেন। তিনি যেমন খুঁৎখুঁতে মানুষ, তাঁর পক্ষে তেমনি খুঁৎখুঁতের কারণ প্রতি পদে জোটে। আসতে যেতে হুঁচট খান, অনেক টানাটানিতে তাঁর দেরাজ খোলে না, যদি বা খোলে, তবু যে জিনিষ খুঁজছিলেন তা পান না। এক একদিন সকালে তাঁর ষ্টাডিতে এসে দেখি, তিনি অকারণে বসে বসে ভ্রূকুটি করে উঁ-আঁ করছেন, ঘরে একটি লোক নেই। কিন্তু ব—আসলে ভালো মানুষ; তিনি খুঁৎ-খুঁতে বটে, রাগী নন, খিট খিট করেন কিন্তু ঝগড়া করেন না। নিদেন তিনি মানুষের উপর রাগ প্রকাশ করেন না, টাইনি ব'লে তাঁর একটা কুকুর আছে, তার উপরেই তাঁর আক্রোশ। সে একটু নড়লে চড়লে তাকে ধমকাতে থাকেন, আর দিন রাত তাকে লাথিয়ে লাথিয়ে একাকার করেন। তাঁকে আমি প্রায় হাসতে দেখিনি। তাঁর কাপড় চোপড় ছেঁড়া অপরিষ্কার। মানুষটা এই রকম। তিনি এককালে পাদ্রি ছিলেন; আমি নিশ্চয় বলতে পারি, প্রতি রবিবারে তাঁর বক্তৃতায় তিনি শ্রোতাদের নরকের বিভীষিকা দেখাতেন। তাঁর এত কাজের ভিড়, এত লোককে পড়াতে হোত যে, এক একদিন তিনি ডিনর খেতে অবকাশ পেতেন না। এক একদিন তিনি বিছানা থেকে উঠে অবধি রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত কাজে ব্যস্ত

থাকতেন। এমন অবস্থায় খিটখিটে হয়ে ওঠা কিছু আশ্চর্য্য নয়। গৃহিণী খুব ভালো মানুষ, রাগী উদ্ধত নন, এককালে বোধ হয় ভালো দেখতে ছিলেন, যত বয়স, তার চেয়ে তাঁকে বড়ো দেখায়, চোখে চসমা, সাজগোজের বড়ো আড়ম্বর নেই। নিজে রাঁধেন, বাড়ির কাজকর্ম্ম করেন, ছেলেপিলে নেই, সুতরাং কাজকর্ম্ম বড়ো বেশি নয়। আমাকে খুব যত্ন করতেন। খুব অল্প দিনেতেই বোঝা যায় যে, দম্পতির মধ্যে বড়ো ভালোবাসা নেই, কিন্তু তাই ব'লে যে, দুজনের মধ্যে খুব বিরোধ ঘটে তাও নয়, অনেকটা নিঃশব্দে সংসার চলে যাচ্চে। মিসেস ব— কখনো স্বামীর ষ্টাডিতে যান না; সমস্ত দিনের মধ্যে খাবার সময় ছাড়া দুজনের মধ্যে দেখা শুনা হয় না, খাবার সময়ে দুজনে চুপ চাপ বসে থাকেন। খেতে খেতে আমার সঙ্গে গল্প করেন, কিন্তু দুজনে পরস্পর গল্প করেন না। ব-র আলুর দরকার হয়েছে, তিনি চাপা গলায় মিসেসকে বললেন, "Some potatoes" (please কথাটা বললেন না কিম্বা শোনা গেল না)। মিসেস ব—বলে উঠলেন "I wish you were a little more polite"। ব—বললেন "I did say 'please'"; মিসেস ব— বললেন "I did not hear it."; ব—বললেন "It was no fault of mine"। এইখানেই দুই পক্ষ চুপ করে রইলেন। মাঝে থেকে আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুতে পড়ে যেতেম। একদিন আমি ডিনরে যেতে একটু দেরি করেছিলেম, গিয়ে দেখি, মিসেস ব ব-কে ধমকাচ্চেন, অপরাধের মধ্যে তিনি মাংসের সঙ্গে একটু বেশি আলু নিয়েছিলেন। আমাকে দেখে মিসেস ক্ষান্ত হলেন, মিষ্টর সাহস পেয়ে শোধ তোলবার জন্যে দ্বিগুণ ক'রে আলু নিতে লাগলেন, মিসেস তাঁর দিকে নিরুপায় মর্ম্মভেদী কটাক্ষপাত করলেন। দুই পক্ষই দুই পক্ষকে যথারীতি ডিয়র ডার্লিঙ ব'লে ভুলেও সম্বোধন করেন না, কিম্বা কারো ক্রিশ্চন নাম ধরে

ডাকেন না, পরস্পর পরস্পরকে মিষ্টর ব—ও মিসেস ব—ব'লে ডাকেন। আমার সঙ্গে মিসেস হয়তো বেশ কথাবার্ত্তা কচ্চেন, এমন সময় মিষ্টর এলেন, অমনি সমস্ত চুপচাপ। দুই পক্ষেই এই রকম। একদিন মিসেস আমাকে পিয়নো শোনাচ্চেন, এমন সময় মিষ্টর এসে উপস্থিত; বললেন, "When are you going to stop ?"

মিসেস বললেন "I thought you had gone out." পিয়নো থামল। তারপরে আমি যখন পিয়নো শুনতে চাইতেম মিসেস বলতেন, "that horrid man যখন বাড়িতে না থাকবেন তখন শোনাব," আমি ভারি অপ্রস্তুতে পড়ে যেতুম। দুজনে এই রকম অমিল অথচ সংসার বেশ চলে যাচ্চে। মিসেস রাঁধছেন বাড়ছেন কাজকর্ম্ম করছেন, মিষ্টর রোজগার করে টাকা এনে দিচ্চেন; দুজনে কখনো প্রকৃত ঝগড়া হয় না, কেবল কখনো কখনো দুই একবার দুই একটা কথা-কাটাকাটি হয়, তা এত মৃদুস্বরে যে, পাশের ঘরের লোকের কানে পর্য্যন্ত পৌঁছয় না। যাহোক আমি সেখানে দিনকতক থেকে বিব্রত হয়ে সে অশান্তির মধ্যে থেকে চলে এসে বেঁচেছি।

অষ্টম পত্র

আমরা এখন লণ্ডন ত্যাগ করে এসেছি। লণ্ডনের জনসমুদ্রে জোয়ারভাঁটা খেলে তা জানো। বসন্তের আরম্ভ থেকে গরমির কিছুদিন পর্য্যন্ত লণ্ডনের জোয়ার ঋতু। এই সময়ে লণ্ডন উৎসবে পূর্ণ থাকে, —থিয়েটর, নাচ, গান, প্রকাশ্য ও পারিবারিক "বল," আমোদ-প্রমোদে

ঘেঁসাঘেঁসি ঠেসাঠেসি। ধনী লোকদের বিলাসিনী মেয়েরা রাতকে দিন ক'রে তোলে। আজ তাদের মাচে নেমন্তন্ন, কাল ডিনরে, পরশু থিয়েটর, তরশু রাত্তিরে ম্যাডাম প্যাটির গান, দিনের চেয়ে রাত্তিরের ব্যস্ততা বেশি। সুকুমারী মহিলা, যাঁদের তিলমাত্র শ্রম লাঘবের জন্য শত শত ভক্ত সেবকের দল দিনরাত্রি প্রাণপণ করছেন,—চৌকিটা সরিয়ে দেওয়া, প্লেটটা এগিয়ে দেওয়া, দরজাটা খুলে দেওয়া, মাংসটা কেটে দেওয়া, পাখাটা কুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি, তাঁরা রাত্তিরের পর রাত্তির নটা থেকে ভোর চারটে পর্য্যন্ত গ্যাসের ও মানুষের নিশ্বাসে গরম ঘরের মধ্যে অবিশ্রান্ত নৃত্যে রত; সে আবার আমাদের দেশের অলস নড়ে চড়ে বেড়ানো বাইনাচের মতো নয়, অনবরত ঘুরপাক। ললিতা রমণীরা কী করে টিকে থাকেন, আমি তাই ভাবি। এই তো গেল আমোদ-প্রমোদ, তাছাড়া এই সময়ে পার্লামেণ্টের অধিবেশন। ব্যাণ্ডের একতান স্বর, নাচের পদশব্দ, ডিনর টেবিলের হাস্যালাপ-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র একটা পোলিটিকাল উত্তেজনা। স্থিতিশীল ও গতিশীল দলভুক্তরা প্রতি রাত্রের পার্লামেণ্টের রাজনৈতিক মল্লযুদ্ধের বিবরণ কী আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করতে থাকে। সীজনের সময় লণ্ডনে এই রকম আলোড়ন। তার পরে আবার ভাঁটা পড়তে আরম্ভ হয়, লণ্ডনের কৃষ্ণপক্ষ আসে। তখন আমোদ কোলাহল বন্ধ হয়ে যায়, বাকি থাকে অল্প স্বল্প লোক, যাদের শক্তি নেই বা দরকার আছে, বা বাইরে যাবার ইচ্ছে নেই। সেই সময়ে লণ্ডন থেকে চলে যাওয়া একটা ফ্যাশন। আমি একটা বইয়ে ("Sketches and Travels in London"—Thackeray) পড়েছিলুম, এই সময়টাতে অনেকে যারা নগরে থাকে তারা বাড়ির সম্মুখে দরজা জানলা সব বন্ধ ক'রে বাড়ির পিছনদিকের ঘরে লুকিয়ে চুরিয়ে বাস করে।

দেখাতে চায় তারা লণ্ডন ছেড়ে চলে গেছে। সাউথ কেনসিংটন বাগানে যাও; ফিতে, টুপি, পালক, রেশম, পশম ও গাল-রঙ-করা মুখের সমষ্টি চোক ঝলসে প্রজাপতির ঝাঁকের মতো বাগান আলো ক'রে বেড়াচ্চে না; বাগান তেমনি সবুজ আছে, সেখানে তেমনি ফুল ফুটেছে, কিন্তু তার সজীব শ্রী নেই। গাড়ি ঘোড়া লোকজনের হিজিবিজি ঘুচে গিয়ে লণ্ডনটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সম্প্রতি লণ্ডনের সীজন অতীত, আমরাও লণ্ডন ছেড়ে টনব্রিজ ওয়েলস্ ব'লে একটা আধা পাড়াগেঁয়ে জায়গায় এসেছি। অনেক দিনের পর হালকা বাতাস খেয়ে বাঁচা গেল। হাজার হাজার চিমনি থেকে অবিশ্রান্ত পাথুরে কয়লার ধোঁয়া ও কয়লার গুঁড়ো উড়ে উড়ে লণ্ডনের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করেছে। রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাত ধুলে সে হাত-ধোয়া জলে বোধ করি কালির কাজ করা যায়। নিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্রান্ত কয়লার গুঁড়ো টেনে মগজটা বোধ হয় অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ হয়ে দাঁড়ায়। টনব্রিজ ওয়েলস্ অনেকদিন থেকে তার লৌহ পদার্থ মিশ্রিত উৎসের জন্যে বিখ্যাত। এই উৎসের জল খাবার জন্যে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। উৎস শুনেই আমরা কল্পনা করলেম—না জানি কী সুন্দর দৃশ্য হবে;—চারিদিকে পাহাড়, পর্ব্বত, গাছপালা, সারস-মরালকুলকূজিত, কমল-কুমুদ-কহ্লার বিকশিত সরোবর, কোকিল-কূজন, মলয়-বীজন, ভ্রমর-গুঞ্জন ও অবশেষে এই মনোরম স্থানে পঞ্চশরের প্রহার ও এক ঘটি জল খেয়ে বাড়ি ফিরে আসা। গিয়ে দেখি, একটা হাটের মধ্যে একটা ছোটো গর্ত্ত পাথর দিয়ে বাঁধানো, সেখানে একটু একটু ক'রে জল উঠছে, একটা বুড়ি কাঁচের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে। এক এক পেনি নিয়ে এক এক গেলাস জল বিতরণ করছে ও অবসর মতো একটা খবরের কাগজে গত রাত্রের

পার্লামেণ্টের সংবাদ পড়ছে। চারদিকে দোকান বাজার; গাছপালার কোনো সম্পর্ক নেই; সম্মুখেই একটা কশাইয়ের দোকান, সেখানে নানা চতুষ্পদেরও "হংস মরাল কুলের" ডানা ছাড়ানো মৃত দেহ দড়িতে ঝুলছে; এই সব দেখে আমার মন এমন চটে উঠল যে, কোনো মতে বিশ্বাস হোলো না যে, এ জলে কোনো প্রকার রোগ নিবারণ বা শরীরের উন্নতি হোতে পারে।

টনব্রিজ ওয়েলস সহরটা খুব ছোটো, দু পা বেরোলেই গাছপালা মাঠ দেখতে পাওয়া যায়। বাড়িগুলো লণ্ডনের মতো থাম-বারান্দা-শূন্য, ঢালু-ছাত-ওয়ালা সারি সারি একঘেয়ে ভাবে দাঁড়িয়ে; অত্যন্ত শ্রীহীন দেখতে। দোকানগুলো তেমনি সুসজ্জিত, পরিপাটী, কাঁচের জানলা দেওয়া। কাঁচের ভিতর থেকে সাজানো পণ্য দ্রব্য দেখা যাচ্চে; কসাইয়ের দোকানে কোনো প্রকার কাঁচের আবরণ নেই, চতুষ্পদের আস্ত আস্ত পা ঝুলছে,—ভেড়া, গরু, শুওর, বাছুরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নানাপ্রকার ভাবে চোখের সামনে টাঙিয়ে রাখা, হাঁস প্রভৃতি নানা প্রকার মরা পাখী লম্বা লম্বা গলাগুলো নিচের দিকে ঝুলিয়ে আছে, আর খুব একটা জোয়ান পেট মোটা ব্যক্তি হাতে একটা প্রকাণ্ড ছুরি নিয়ে কোমরে একটা আঁচলা ঝুলিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

বিলেতের ভেড়া গরুগুলো তাদের মোটাসোটা মাংস চর্ব্বিওয়ালা শরীরের ও সুস্বাদের জন্য বিখ্যাত, যদি কোনো মানুষ-খেগো সভ্য জাত থাকত, তাহোলে বোধ হয় বিলেতের কসাইগুলো তাদের হাটে অত্যন্ত মাঘি দামে বিকোত। একজন মেমসাহেব বলেন যে, কশাইয়ের দোকান দেখলে তাঁর অত্যন্ত তৃপ্তি হয়; মনে আশ্বাস হয়, দেশে আহারের অপ্রতুল নেই, দেশের পেট ভরাবার মতো খাবার প্রচুর আছে, দুর্ভিক্ষের কোনো সম্ভাবনা

নেই। ইংরেজদের খাবার টেবিলে যে রকম আকারে মাংস এনে দেওয়া হয়, সেটা আমার কাছে দুঃখজনক। কেটে কুটে মসলা দিয়ে মাংস তৈরি ক'রে আনলে এক রকম ভুলে যাওয়া যায় যে, একটা সত্যিকার জন্তু খেতে বসেছি; কিন্তু মুখ পা বিশিষ্ট আস্ত প্রাণীকে অবিকৃত আকারে টেবিলে এনে দিলে একটা মৃত দেহ দেখতে বসেছি ব'লে গা কেমন করতে থাকে।

নাপিতের দোকানের জানলায় নানা প্রকার কাঠের মাথায় নানাপ্রকার কোঁকড়ানো পরচুলো বসানো রয়েছে, দাড়ি গোঁফ ঝুলছে, মার্কামারা শিশিতে টাক-নাশক চুল-উঠে-যাওয়া-নিবারক অব্যর্থ ওষুধ রয়েছে; দীর্ঘকেশী মহিলারা এই দোকানে গেলে সেবকেরা (সেবিকা নয়) তাঁদের মাথা ধুয়ে দেবে, চুল বেঁধে দেবে, চুল কুঁকড়ে দেবে। এখেনে মদের দোকানগুলোই সব চেয়ে জমকালো, সন্ধ্যের সময় সেগুলো আলোয় আকীর্ণ হয়ে যায়, বাড়িগুলো প্রকাণ্ড নয়, ভিতরটা খুব বড়ো ও সাজানো, খদ্দেরের ঝাঁক দোকানের বাইরে ও ভিতরে সর্ব্বদাই, বিশেষতঃ সন্ধ্যে বেলায় লেগে থাকে। দরজির দোকানও মন্দ নয়। নানা ফেশানের সাজসজ্জা কাঁচের জানলার ভিতর থেকে দেখা যাচ্চে, বড়ো বড়ো কাঠের মূর্ত্তিকে কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে; মেয়েদের কাপড়চোপড় একদিকে ঝোলানো; এই খানে কত লুব্ধ নেত্র দিনরাত্রি তাকিয়ে আছে তার সংখ্যা নেই; এখানকার বিলাসিনীরা, যাদের নতুন ফেশানের দামি কাপড় কেনবার টাকা নেই, তারা দোকানে এসে কাপড়গুলো ভালো ক'রে দেখে যায়, তার পরে বাড়িতে গিয়ে সস্তায় নিজের হাতে তৈরি করে।

আমাদের বাড়ির কাছে একটা খোলা পাহাড়ে' জায়গা আছে; সেটা কমন্ অর্থাৎ সরকারী জায়গা; চারিদিক খোলা, বড়ো গাছ খুব অল্প; ছোটো ছোটো গুল্মের ঝোপ ও ঘাসে পূর্ণ, চারিদিক সবুজ,

বিচিত্র গাছপালা নেই ব'লে কেমন ধূ ধূ করছে, কেমন বিধবার মতো চেহারা। উঁচু নিচু জমি, কাঁটাগাছের ঝোপঝাপ, জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগে; মাঝে মাঝে এই রকম কাঁটা খোঁচা এবড়ো খেবড়োর মধ্যে এক এক জায়গায় ছোটো ছোটো ব্লু-বেল্‌স নামক ছোটো ছোটো ফুল ঘেঁসাঘেঁসি ফুটে সবুজের মধ্যে স্তূপাকার নীল রং ছড়িয়ে রেখেছে, কোথাও বা ঘাসের মধ্যে রাশ রাশ সাদা ডেজি ও হল্‌দে বাটার-কপ অজস্র সৌন্দর্য্যে প্রকাশিত। ঝোপঝাপের মাঝে মাঝে এবং গাছের তলায় এক একটা বেঞ্চি পাতা। এইটে সাধারণের বেড়াবার জায়গা। এখানে মানুষ এত অল্প ও জায়গা এত বেশি, যে ঘেঁসাঘেঁসি নেই। লণ্ডনের বড়ো বড়ো বেড়াবার বাগানের মতো চারদিকেই ছাতা-হস্তক, টুপি-মস্তক, চোক-ধাঁধক ভিড়ের আনাগোনা নেই; দূর দূর বেঞ্চির মধ্যে নিরালা যুগলমূর্ত্তি রোদ্দুরে এক ছাতার ছায়ায় আসীন; কিম্বা তারা হাত ধরাধরি ক'রে নিরিবিলি বেড়াচ্চে। সবসুদ্ধ জড়িয়ে জায়গাটা উপভোগ্য। এখনো গরমিকাল শেষ হয়নি। এখেনে গরমিকালে সকাল ও সন্ধ্যে অত্যন্ত সুন্দর। গরমির পূর্ণ যৌবনের সময় রাত দুটো তিনটের পরে আলো দেখা দিতে আরম্ভ করে, চারটের সময় রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে ও রাত্রি নটা দশটার আগে দিনের আলো নেভে না। আমি একদিন পাঁচটার সময় উঠে কমন্‌-এ বেড়াতে গিয়েছিলুম। পাহাড়ের উপর একটা গাছের তলায় গিয়ে বসলুম, দূরে ছবির মতো ঘুমন্ত সহর, একটুও কুয়াসা নেই। নির্জ্জন রাস্তাগুলি, গির্জ্জের উন্নত চূড়া, রৌদ্ররঞ্জিত বাড়িগুলি নীল আকাশের পটে যেন একটি কাঠে খোদাই করা ছবির মতো আঁকা। আসলে এই সহরটা কিছুই ভালো দেখতে নয়; এখানকার বাড়িগুলোতে জানলা-কাটা-কাটা চারটে দেয়াল, একটা ঢালু ছাত ও তার উপরে ধোঁয়া বেরোবার কতকগুলি

কুশ্রী নল। ক্রমে ক্রমে যতই বেলা হোতে লাগল শত শত চিমনি থেকে অমনি ধোঁয়া বেরোতে লাগল, ধোঁয়াতে ক্রমে সহরটা অস্পষ্ট হয়ে এল, রাস্তায় ক্রমে মানুষ দেখা দিল, গাড়ি ঘোড়া ছুটতে আরম্ভ হোলো, হাতগাড়ি কিম্বা ঘোড়ার গাড়িতে ক'রে দোকানীরা মাংস রুটি তরকারী বাড়ি বাড়ি বিতরণ ক'রে বেড়াতে লাগল, (এখানে দোকানীরা বাড়িতে বাড়িতে জিনিষপত্র দিয়ে আসে) ক্রমে কমন্-এ লোক জমতে সুরু হোলো, আমি বাড়ি ফিরে এলেম।

এখানে আমার একটি সখের বেড়াবার জায়গা আছে। গাড়ির চাকার দাগে এবড়ো খেবড়ো উঁচু নিচু পাহাড়ে রাস্তা, দুধারে ব্লাকবেরি ও ঘন লতা গুল্মের বেড়া, বড়ো বড়ো গাছে ছায়া ক'রে আছে, রাস্তার আশে পাশে ঘাস ও ঘাসের মধ্যে ডেইজি প্রভৃতি বুনো ফুল। শ্রমজীবীরা ধূলো-কাদা-মাখানো ময়লা কোট প্যাণ্টলুন ও ময়লা মুখ নিয়ে আনাগোনা করছে, ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে লাল লাল ফুলো ফুলো মুখে বাড়ির দরজার বাইরে কিম্বা রাস্তায় খেলা করছে, এমন মোটাসোটা গোলগাল ছেলে কোনো দেশে দেখিনি। এক একটা বাড়ির কাছে ছোটো ছোটো পুকুরের মতো, সেখেনে পোষা হাঁসগুলো ভাসছে। মাঠগুলো যদিও পাহাড়ে উঁচু নিচু, কিন্তু চসা জমি সমতল ও পরিষ্কার। ঘাসগুলো অত্যন্ত সবুজ ও তাজা, এখানে রৌদ্র তীব্র নয় ব'লে ঘাসের রং আমাদের দেশের মতন জ্বলে যায় না, তাই এখানকার মাঠের দিকে চেয়ে থাকতে অত্যন্ত ভালো লাগে, অজস্র স্নিগ্ধ সবুজ রঙে চোখ যেন ডুবে যায়। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো গাছ ও শাদা শাদা বাড়িগুলো দূর থেকে ছোটো ছোটো দেখাচ্চে। এই রকম শূন্য মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে এক একটা প্রকাণ্ড পাইন গাছের অরণ্য পাওয়া যায়, ঘেঁসাঘেঁসি গাছে অনেক দূর জুড়ে অন্ধকার, খুব গম্ভীর, খুব নিস্তব্ধ।

নবম পত্র

গরমি কাল। সুন্দর সূর্য্য উঠেছে। এখন দুপুর দুটো বাজে। আমাদের দেশের শীতকালের দুপুর বেলাকার বাতাসের মতো বেশ একটি মিষ্টি হাওয়া, রোদ্দুরে চার দিক ঝাঁ ঝাঁ করছে। এমন ভালো লাগছে, আর এমন একটু কেমন উদাস ভাব মনে আসছে যে কী বলব।

আমরা এখন ডেভনশিয়রের অন্তর্গত টর্কী ব'লে এক নগরে আছি। সমুদ্রের ধারে। চার দিকে পাহাড়। অতি পরিষ্কার দিন। মেঘ নেই, কুয়াশা নেই, অন্ধকার নেই; চারিদিকে গাছপালা, চারিদিকে পাখী ডাকছে, ফুল ফুটছে। যখন টনব্রিজ ওয়েলসে ছিলুম, তখন ভাবতুম, এখেনে যদি মদন থাকে, তবে অনেক বন বাদাড়, ঝোপ ঝাপ, কাঁটা গাছ হাতড়ে দুচারটে বুনো ফুল নিয়েই কোনোমতে তাকে ফুলশর বানাতে হয়। কিন্তু টর্কিতে মদন যদি গ্যাটলিং কামানের মতো এমন একটা বাণ উদ্ভাবন ক'রে থাকে, যার থেকে প্রতি মিনিটে হাজারটা ক'রে তীর ছোঁড়া যায়, আর সেই বাণ দিনরাত যদি কাজে ব্যস্ত থাকে, তবু মদনের ফুলশরের তহবিল এখেনে দেউলে হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, এত ফুল। যেখানে সেখানে, পথে ঘাটে, ফুল মাড়িয়ে চলতে হয়। আমরা রোজ পাহাড়ে বেড়াতে যাই। গরু চরছে, ভেড়া চরছে; এক এক জায়গায় রাস্তা এত ঢালু যে, উঠতে নাবতে কষ্ট হয়। এক এক জায়গায় খুব সঙ্কীর্ণ পথ, দুধারে গাছ উঠেছে আঁধার ক'রে ওঠবার সুবিধের জন্যে ভাঙা ভাঙা সিঁড়ির মতন আছে, পথের মধ্যেই লতা গুল্ম উঠেছে। চার দিকে মধুর রোদ্দুর। এখানকার বাতাস বেশ গরম। ভারতবর্ষ মনে পড়ে।

এইটুকু গরমেই লণ্ডনের প্রাণীদের চেয়ে এখানকার জীবজন্তুদের কত নির্জ্জীব ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। ঘোড়াগুলো আস্তে আস্তে যাচ্চে, মানুষগুলোর তেমন ভারি ব্যস্ত ভাব নেই, গড়িমসি ক'রে চলেছে।

এখানকার সমুদ্রের ধার আমার বড়ো ভালো লাগে। যখন জোয়ার আসে, তখন সমুদ্রতীরের খুব প্রকাণ্ড পাথরগুলো জলে ডুবে যায়, তাদের মাথা বেরিয়ে থাকে। ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো দেখায়। জলের ধারেই ছোটো-বড়ো কত পাহাড়। ঢেউ লেগে লেগে পাহাড়ের নিচে গুহা তৈরি হয়ে গেছে; যখন ভাঁটা পড়ে যায়, তখন আমরা এক এক দিন এই গুহার মধ্যে গিয়ে ব'সে থাকি। গুহার মধ্যে জায়গায় জায়গায় অতি পরিষ্কার একটু একটু জল জমে রয়েছে, ইতস্ততঃ সমুদ্র-শৈবাল জমে আছে, সমুদ্রের একটা স্বাস্থ্যজনক গন্ধ পাওয়া যাচ্চে, চারদিকে পাথর ছড়ানো। আমরা সবাই মিলে এক এক দিন সেই পাথরগুলো ঠেলাঠেলি ক'রে নড়াবার চেষ্টা করি, নানা শামুক ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসি। এক একটা পাহাড় সমুদ্রের জলের উপর খুব ঝুঁকে পড়েছে; আমরা প্রাণপণ ক'রে এক এক দিন সেই অতি দুর্গম পাহাড়গুলোর উপর উঠে ব'সে নিচে সমুদ্রের ঢেউয়ের ওঠাপড়া দেখি। হু হু শব্দ উঠছে, ছোটো ছোটো নৌকো পাল তুলে চলে যাচ্চে, চারদিকে রোদ্দুর, মাথার উপর ছাতা খোলা, পাথরের উপর মাথা দিয়ে আমরা শুয়ে শুয়ে গল্প করছি। আলস্যে কাল কাটাবার এমন জায়গা আর কোথায় পাব? এক এক দিন পাহাড়ে যাই, আর পাথর-দিয়ে ঘেরা ঝোপঝাপে-ঢাকা একটি প্রচ্ছন্ন জায়গা দেখলে সেই খাদটিতে গিয়ে বই নিয়ে পড়তে বসি।

দশম পত্র

ক্রিষ্ট মাস ফুরল, আবার দেখতে দেখতে আর একটা উৎসব এসে পড়ল। আজ নূতন বর্ষের প্রথম দিন। কিন্তু তার জন্যে কিছুই গোলমাল দেখতে পাচ্চিনে। নূতন বৎসর যে এখানে এমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসবে তা জানতেম না। শুনেছি ফ্রান্সে লোকে নতুন বৎসরকে খুব সমাদরের সঙ্গে আবাহন করে। কাল পুরাতন বৎসরের শেষ রাত্রে আমাদের প্রতিবেশীরা বাড়ির জানলা খুলে রেখেছিল। পাছে পুরোনো বৎসর ঘরের মধ্যে আট্‌কা পড়ে থাকে, পাছে নতুন বৎসর এসে জানলার কাছে বৃথা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

টর্কি থেকে বহুদিন হোলো আমরা আবার লণ্ডনে এসেছি। এখন আমি ক-র পরিবারের মধ্যে বাস করি। তিনি, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের চার মেয়ে, দুই ছেলে, তিন দাসী, আমি ও টেবি ব'লে এক কুকুর নিয়ে এই বাড়ির জনসংখ্যা। মিষ্টর ক—একজন ডাক্তার। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি প্রায় সমস্ত পাকা। বেশ বলিষ্ঠ ও সুশ্রী দেখতে। অমায়িক স্বভাব, অমায়িক মুখশ্রী। মিসেস্ ক—আমাকে আন্তরিক যত্ন করেন। শীতের সময় আমি বিশেষ গরম কাপড় না পরলে তাঁর কাছে ভৎর্সনা খাই। খাবার সময় যদি তাঁর মনে হয়, আমি কম ক'রে খেয়েছি, তাহোলে যতক্ষণ না তাঁর মনের মতো খাই, ততক্ষণ পীড়াপীড়ি করেন। বিলেতে লোকে কাশিকে ভয় করে; যদি দৈবাৎ আমি দিনের মধ্যে দুবার কেশেছি তা হোলেই, তিনি জোর ক'রে আমার স্নান বন্ধ করান, আমাকে দশ রকম ওষুধ গেলান, শুতে যাবার আগে আমার পায়ে খানিকটা গরম জল ঢালবার বন্দোবস্ত করেন,

তবে ছাড়েন। বাড়ির মধ্যে সকলের আগে বড়ো মিস্ ক—ওঠেন। তিনি নিচে এসে ব্রেকফাষ্ট তৈরি হয়েছে কিনা তদারক করেন; অগ্নি-কুণ্ডে দু চার হাতা কয়লা দিয়ে ঘরটি বেশ উজ্জ্বল ক'রে রাখেন। খানিক বাদে সিঁড়িতে একটা দুদ্দাড় পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বুড়ো শীতে হি হি করতে করতে খাবার ঘরে এসে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি আগুনে হাত, পা, পিঠ, বুক তাতিয়ে খবরের কাগজ হাতে খাবার টেবিলে এসে বসেন। তাঁর বড়ো মেয়েকে চুম্বন করেন, আমার সঙ্গে সুপ্রভাত অভিবাদন হয়। লোকটা প্রফুল্ল। আমার সঙ্গে খানিকটা হাসি তামাসা হয়, খবরের কাগজ থেকে এটা ওটা পড়ে শোনান। তাঁর এক পেয়ালা কফি শেষ হয়ে গেছে, এমন সময়ে তাঁর আর দুটি মেয়ে এসে তাঁকে চুম্বন করলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্দোবস্ত ছিল যে, তাঁরা যেদিন মিষ্টর ক-র আগে উঠবেন, সে দিন মিষ্টর ক—তাঁদের পাঁচ সিকে পুরস্কার দেবেন, আর যে দিন মিষ্টর ক—তাঁদের আগে উঠবেন, সেদিন তাঁদের চার আনা দণ্ড দিতে হবে। যদিও এত অল্প দিতে হোত, তবু তাঁদের কাছে প্রায় দু তিন পাউণ্ড পাওনা হয়েছে। রোজ সকালে পাওনাদার পাওনার দাবি করেন। কিন্তু দেনদাররা হেসেই উড়িয়ে দেন। ক—বলেন "এ ভারি অন্যায়!" আমাকে মাঝে মাঝে মধ্যস্থ মেনে বলেন "আচ্ছা মিষ্টর টি—তুমিই বলো, এ রকম ডেট্ অফ্ অনর্ ফাঁকি দেওয়া কি ভদ্রতা?" যাহোক পরিশোধের অভাবে পাওনা বেড়েই চলেছে। তার পরে মিস্ ক-এলেন। আমাদের ব্রেকফাষ্ট প্রায় সাড়ে নটার মধ্যে শেষ হয়। বাড়ির বড়ো ছেলে আগেই খাওয়া সেরে কাজে গিয়েছেন, আর মিষ্টর ক-র ছোটো ছেলেটি ও ছোটো মেয়েটি অনেকক্ষণ হোলো খাওয়া শেষ করেছে। এক জনের কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। টেবি কুকুরটি

অনেকক্ষণ হোলো এসে আগুনের কাছে আরামে বসে আছে। ছোট্ট কুকুরটি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রোঁয়া। রোঁয়াতে চোখ মুখ ঢাকা। বুড়ো হয়েছে, আর তার একটা চোখ কানা হয়ে গেছে। আদর পেয়ে পেয়ে এই ব্যক্তির অভ্যেস হয়েছে নবাবি চাল। ড্রয়িং রুম ছাড়া অন্য কোনো ঘরে তার মন বসে না। ঘরের সকলের চেয়ে ভালো কেদারাটিতে অম্লানবদনে লাফিয়ে উঠে বসে, একপাশে যদি আর কেউ এসে বস্‌ল, অমনি সে সদর্পে পাশেব কৌচটির উপরে গিয়ে বসে পড়ে। সকাল বেলায় ব্রেকফাষ্টের সময় তার তিনটি বিস্কুট বরাদ্দ। সে বিস্কুটগুলি নিয়ে খাবার ঘরে বসে থাকে, যতক্ষণ না আমি গিয়ে সেই বিস্কুটগুলি নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা খেল করি, একবার তার মুখ থেকে কেড়ে নিই, একবার গড়িয়ে দিই। আগে আগে যখন আমার উঠতে দেরি হোত; সে তাব বরাদ্দ বিস্কুট নিয়ে আমার শোবার ঘরের কাছে বসে ঘেউ ঘেউ কবত। কিন্তু গোল করলে বিরক্ত হতুম দেখে সে এখন আর ঘেউ ঘেউ করে না। আস্তে আস্তে পা দিয়ে দরজা ঠেলে, যতক্ষণ না দরজা খুলে দিই—চুপ ক'রে বাইরে বসে থাকে। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরোলেই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে লেজ নেড়ে উৎসাহ প্রকাশ করে; তার পরে একবার বিস্কুটেব দিকে চায়, একবার আমার মুখের দিকে। যাহোক সাড়ে নটার মধ্যে ব্রেকফাষ্ট শেষ হয়। তার পরে হাতে দস্তানা-পরা গৃহিণী দাসীদের নিয়ে তাঁর চৌতলা থেকে এক তলা পর্য্যন্ত, জিনিষপত্র গুছিয়ে, ঘর দ্বার পরিষ্কার ও গৃহকার্য্য তদারক ক'রে উঠা-নাবায় প্রবৃত্ত। একবার রান্না ঘবে যান, সেখানে শাকওয়ালা, রুটিওয়ালা, মাংসওয়ালার বিল দেখেন, দেনা চুকিয়ে দেন। মাঝে মাঝে উপরে এসে কর্ত্তার সঙ্গে গৃহকার্য্যের পরামর্শ হয়। রান্নাঘরেব উপকরণ পরিষ্কার আছে কিনা ও যথাস্থানে তাদের

রাখা হয়েছে কিনা দেখেন, ভালো মাংস এনেছে কিনা, ওজনে কম পড়েছে কিনা তদন্ত করেন। রাঁধুনীর সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগ দেন। এই রকম ব্রেকফাষ্টের পর থেকে প্রায় বেলা একটা দেড়টা পর্য্যন্ত তাঁকে নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে তাঁর বড়ো মেয়ে যোগ দেন। মেঝো মেয়ে প্রত্যহ একটি ঝাড়ন নিয়ে ড্রয়িং রুম সাফ করেন। দাসীরা ঘর ঝাঁট দিয়ে যায়, আর জিনিষপত্র যা কিছু ধূলো লাগে তা তিনি নিজের হাতে ঝেড়ে ঝুড়ে সাফ করেন। তৃতীয় মেয়ে বালিশের আচ্ছাদন, আসন, মোজা, কাপড় প্রভৃতি নানাবিধ সেলাইয়ে নিযুক্ত হন, চিঠিপত্র লেখেন, এক এক দিন বাজনা ও গান অভ্যাস করেন। বাড়ির মধ্যে তিনিই গাইয়ে বাজিয়ে। আজকাল স্কুল বন্ধ, ছোটো ছেলেটি ও মেয়েটি ভারি খেলায় মগ্ন। দেড়টার সময় আমাদের লঞ্চ খাওয়া সমাপন হোলে আবার যিনি যাঁর কাজে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ভিজিটরদের আসবার সময়। হয়তো মিসেস্ ক—তাঁর স্বামীর একজোড়া ছেঁড়া মোজা নিয়ে চসমা প'রে ড্রয়িং রুমে ব'সে সেলাই করছেন। ছোটো মেয়ে একটি পশমের জামা তাঁর ভাইপোর জন্যে তৈরি ক'রে দিচ্চেন। মেঝো মেয়েটি একটু অবসর পেয়ে আগুনের কাছে ব'সে হয়ত গ্রীনের লিখিত ইংরেজ জাতির ইতিহাস পড়তে নিযুক্ত। বড়ো মিস্ ক—হয়তো তাঁর কোনো আলাপির বাড়িতে ভিজিট করতে গিয়েছেন। তিনটের সময় হয়তো একজন ভিজিটর এলেন। দাসী ড্রয়িংরুমে এসে নাম উচ্চারণ করলে "মিষ্টর ও মিসেস ক"; বলতে বলতে ঘরের মধ্যে তাঁরা দুজনে উপস্থিত। মোজা জামা রেখে বই মুড়ে গৃহিণী ও তাঁর কন্যারা আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করলেন। আবহাওয়া সম্বন্ধে পরস্পরের মতামতের ঐক্য নিয়ে আলাপ সুরু হোলো। মিসেস এ বললেন, "মিষ্টর এক্‌সে-র ৪৩ বৎসর বয়সে হার্ম হয়। হার্ম

হয়েছিল ব'লে তিনি চার দিন আপিসে যেতে পারেন নি। কাল আপিসে গিয়েছিলেন। তাঁর হামের প্রসঙ্গে আপিসের লোকেরা তাঁকে নির্দ্দয়রূপে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেছে।" অন্যেরা লোকটির সম্বন্ধে দরদ প্রকাশ করলে। এই কথা থেকে ক্রমে হাম রোগের বিষয়ে যত কথা উঠতে পারে উঠল। মিস্ এ—খবর দিলেন মিষ্টর জ-এর তৃতীয় ছেলেটির হাম হয়েছে। তার থেকে কথা উঠল যে, মিষ্টর জ-এর যে এক পিতৃব্য বোন মিস্ ই—অষ্ট্রেলিয়ায় আছেন, তাঁর কাপ্তেন ব-এর সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেছে। এইরকম খানিকক্ষণ কথোপ-কথন হোলে পর তাঁরা চ'লে গেলেন। বিকেলে হয়তো আমরা সবাই মিলে একটু বেড়াতে গেলুম। বেড়িয়ে এসে সাড়ে ছটার সময় আমাদের ডিনর। ডিনর খেয়ে সাতটার সময় আমরা সবাই মিলে ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসি। আগুন জ্বলছে। ঘরটি বেশ গরম হয়ে উঠেছে। আমরা আগুনের চারদিকে ঘিরে বসলুম। এক এক দিন আমাদের গান বাজনা হয়। আমি ইতিমধ্যে অনেক ইংরেজি গান শিখেছি। আমি গান করি। মিস্ এ—বাজান। মিস্ এ—আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সন্ধ্যেবেলায় আমাদের একটু আধটু পড়াশুনা হয়। আমরা পালা ক'রে ছ দিনে ছ রকমের বই পড়ি। বই পড়তে পড়তে এক এক দিন প্রায় ১১॥টা ১২টা হয়ে যায়।

ছেলেদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। তারা আমাকে আর্থর খুড়ো বলে। এথেল্ ছোটো মেয়েটির ইচ্ছে যে, আমি কেবল একলা তারই আঙ্কল্ আর্থর হই। তার ভাই টম যদি আমাকে দাবী করে তবেই তার দুঃখ। একদিন টম তার ছোটো বোনকে রাগাবার জন্যে একটু বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিল, আমারই আঙ্কল্ আর্থর। তখনি এথেল আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে ঠোঁট দুটি ফুলিয়ে কাঁদতে আরম্ভ

ক'রে দিলে। টম একটু অস্থির, কিন্তু ভারি ভালোমানুষ। খুব মোটা-সোটা। মাথাটা খুব প্রকাণ্ড। মুখটা খুব ভারি ভারি। সে এক এক সময়ে আমাকে এক একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, "আচ্ছা, আঙ্কল্ আর্থর, ইন্দুররা কী করে?" আঙ্কল্ বললেন "তারা রান্নাঘর থেকে চুরি ক'রে খায়।" সে একটু ভেবে বললে, "চুরি ক'রে? আচ্ছা, চুরি করে কেন?" আঙ্কল্ বললেন, "তাদের ক্ষিদে পায় ব'লে।" শুনে টম-এর বড়ো ভালো লাগল না। সে বরাবর শুনে আসছে যে, জিজ্ঞাসা না ক'রে পরের জিনিষ নেওয়া অন্যায়। আর একটি কথা না ব'লে সে চলে গেল। যদি তার বোন কখনো কাঁদে, সে তাড়াতাড়ি এসে সান্ত্বনার স্বরে বলে, "Oh, poor Ethel, don't you cry! Poor Ethel!" এথেলের মনে মনে জ্ঞান আছে যে, সে একজন লেডি। সে কেবল গম্ভীরভাবে কেদারায় ঠেস দিয়ে বসে। টমকে এক এক সময়ে ভৎর্সনা ক'রে বলে, "আমাকে বিরক্ত কোরো না।" একদিন টম পড়ে গিয়ে কাঁদছিল। আমি তাকে বললেম "ছি, কাঁদতে আছে!" অমনি এথেল আমার কাছে ছুটে এসে জাঁক ক'রে বললে "আঙ্কল্ আর্থর, আমি একবার ছেলেবেলায় রান্নাঘরে পড়ে গিয়েছিলেম, কিন্তু কাঁদিনি।" ছেলেবেলায়!

মিষ্টর ন—, ডাক্তারের আর এক ছেলে বাড়িতে থাকেন কিন্তু তাঁকে দেখতে পাইনে। তিনি সমস্ত দিন আপিসে। আপিস থেকে এলেও তাঁর বড়ো একটা দেখা পাওয়া যায় না। তার কারণ মিস্ ই-র সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ। তাঁদের দুজনে কোর্টশিপ চলছে। রবিবার দুবেলা প্রেয়সীকে নিয়ে তাঁর চর্চ্চে যেতে হয়। যখন বিকেলে একটু অবসর পান, প্রণয়িনীর বাড়িতে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যে বেলা তাঁদের বাড়িতে তাঁর নেমন্তন্ন। এই রকমে তাঁর

সময় ভারি অল্প। উভয়ে পরস্পরকে নিয়ে এমন সুখী আছেন যে, অবসর কাল কাটাবার জন্যে অন্য কোনো জীবের সঙ্গ তাঁদের আবশ্যক করে না। শুক্রবার সন্ধ্যেবেলায় যদি আকাশ ভেঙে পড়ে তবু ন—পরিষ্কার ক'রে চুলটি ফিরিয়ে, পমেটম মেখে, কোট ব্রশ ক'রে ফিট্‌ফাট্ হয়ে, ছাতা হাতে বাড়ি থেকে বেরাবেনই। একবার খুব শীত পড়েছিল, আর তাঁর ভারি কাশি হয়েছিল; মনে করলেম, আজ বুঝি বেচারীর আর যাওয়া হয় না। ৭ টা বাজতে না বাজতেই দেখি তিনি ফিট্‌ফাট্ হয়ে নেবে এসেছেন।

যা হোক, আমার এই পরিবারের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সে-দিন মেঝো মেয়ে আমাকে বলছিলেন যে, প্রথম যখন তাঁরা শুনলেন যে, একজন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তাঁদের মধ্যে বাস করতে আসছে, তাঁদের ভারি ভয় হয়েছিল। যেদিন আমার আসবার কথা সেইদিন মেঝো ও ছোটো মেয়ে, তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক হপ্তা বাড়িতে আসেন নি। তার পর হয়তো যখন তাঁরা শুনলেন যে, মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে উল্কি নেই, ঠোঁট বিঁধিয়ে অলঙ্কার পরেনি, তখন তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন। ওরা বলেন যে প্রথম প্রথম এসে যদিও আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়েছিলেন তবুও দুদিন পর্য্যন্ত আমার মুখ দেখেন নি। হয়তো ভয় হয়েছিল যে, কী অপূর্ব্ব ছাঁচে ঢালাই মুখই না জানি দেখবেন। তার পর যখন মুখ দেখলেন—তখন?

যা হোক্, এই পরিবারে সুখে আছি। সন্ধ্যেবেলা আমোদে কেটে যায়;—গান, বাজনা, বই পড়া। আর এথেল তার আঙ্কল আর্থরকে মুহূর্ত্ত ছেড়ে থাকতে চায় না।

১২৮৮

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

উৎসর্গ

লোকেন্দ্রনাথ পালিত

সুহৃদ্বরকে এই গ্রন্থ

স্মরণোপহার স্বরূপে

উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার।

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

শুক্রবার। ২২শে আগষ্ট ১৮৯০। দেশকালের মধ্যে যে একটা প্রাচীন ঘনিষ্ঠতা আছে, বাষ্পযানে সেটা লোপ ক'রে দেবার চেষ্টা করছে। পূর্ব্বে, সময় দিয়ে দূরত্বের পরিমাণ হোত; লোকে বল্‌ত এক প্রহরের রাস্তা, দুদিনের রাস্তা। এখন কেবল গজের মাপটাই অবশিষ্ট। দেশকালের চিরদাম্পত্যের মাঝখান দিয়ে অবাধে বড়ো বড়ো কলের গাড়ি এবং কলের জাহাজ চ'লে যাচ্চে।

কেবল তাই নয়—এসিয়া এবং আফ্রিকা দুই ভগ্নীর বাহুবন্ধন বিচ্ছিন্ন ক'রে মাঝে বিরহের লবণাম্বুরাশি প্রবাহিত করা হয়েছে। আমেরিকার উত্তর দক্ষিণ যমজ ভ্রাতার মতো জন্মাবধি সংলগ্ন হয়ে আছে, শোনা যায় তাদের মধ্যেও লৌহাস্ত্র চালনার উদ্যোগ করা হয়েছিল। এমনি ক'রে সভ্যতা সর্ব্বত্রই জলে স্থলে দেশে কালে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে আপনার পথটি ক'রে নেবার চেষ্টা করছে।

পূর্ব্বে যখন দীর্ঘ পথ প্রদক্ষিণ ক'রে য়ুরোপে পৌঁছতে অর্দ্ধেক বৎসর লাগত তখন এই দুই মহাদেশের যথার্থ ব্যবধান সম্পূর্ণ ধারণা করবার দীর্ঘকাল অবসর পাওয়া যেত। এখন ক্রমেই সেটা হ্রাস হয়ে আসছে।

কিন্তু দেশকালের ঘনিষ্ঠতা যতই হ্রাস হোক, চিরকালের অভ্যাস একেবারে যাবার নয়। যদিও তিন মাসের টিকিট মাত্র নিয়ে য়ুরোপে চলেছি, তবু একটা কাল্পনিক দীর্ঘকালের বিভীষিকা মন থেকে তাড়াতে পারছিনে। মনে হচ্চে যেন অনেক দিনের জন্যে চলেছি।

কালিদাসের সময়ে যখন রেলগাড়ী, ইষ্টিমার, পোষ্ট আপিস ছিল

না তখনি খাঁটি বিরহ ছিল; এবং তখনকার দিনে বছর খানেকের জন্য রামগিরিতে বদলি হয়ে যক্ষ যে সুদীর্ঘচ্ছন্দে বিলাপ পরিতাপ করেছিল সে তার পক্ষে অযথা হয় নি। কিন্তু স্তূপাকার তুলো যেমন কলে চেপে একটি পরিমিত গাঁঠে পরিণত হয়, সভ্যতার চাপে আমাদের সমস্তই তেম্‌নি সংক্ষিপ্ত নিবিড় হয়ে আসছে। ছয় মাসকে জাঁতার তলায় ফেলে তিন মাসের মধ্যে ঠেসে দেওয়া হচ্চে; পূর্ব্বে যা মুটের মাথার বোঝা ছিল এখন তা পকেটের মধ্যে ধরে। এখন দুই এক পাতার মধ্যেই বিরহ গীতি সমাপ্তি; এবং বিদ্যুৎযান যখন প্রচলিত হবে তখন বিরহ এত গাঢ় হবে যে, চতুর্দ্দশপদীও তার পক্ষে ঢিলে বোধ হবে।

সূর্য্য অস্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম। সমুদ্রের জল সবুজ, তীরের রেখা নীলাভ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে এবং জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ক্রমশই অগ্রসর হচ্চে। বামে বোম্বাই বন্দরের দীর্ঘরেখা এখনো দেখা যাচ্চে।

ক্রমে বন্দর ছাড়িয়ে গেলুম। সন্ধ্যার মেঘাবৃত অন্ধকারটি সমুদ্রের অনন্ত শয্যায় দেহ বিস্তার করলে। আকাশে তারা নেই। কেবল দূরে লাইট-হাউসের আলো জ্ব'লে উঠল; সমুদ্রের শিয়রের কাছে সেই কম্পিত দীপশিখা যেন ভাসমান সন্তানদের জন্যে ভূমিমাতার আশঙ্কাকুল জাগ্রত দৃষ্টি।

জাহাজ বোম্বাই বন্দর পার হয়ে গেল।

ভাস্‌ল তরী সন্ধ্যেবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।—

কিন্তু সী-সিক্‌নেসের কথা কে মনে করেছিল!

যখন সবুজ জল ক্রমে নীল হয়ে এল এবং তরঙ্গে তরীতে মিলে' আন্দোলন উপস্থিত ক'রে দিলে তখন দেখলুম সমুদ্রের পক্ষে জলখেলা বটে কিন্তু আমার পক্ষে নয়।

ভাবলুম এই বেলা মানে মানে কুঠরির মধ্যে ঢুকে কম্বলটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়িগে। যথাসত্বর ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ ক'রে কাঁধ থেকে কম্বলটা বিছানার উপর ফেলে দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম। ঘর অন্ধকার। বুঝ্‌লুম, আলো নিবিয়ে দিয়ে দাদা তাঁর বিছানায় শুয়েছেন। শারীরিক দুঃখ নিবেদন ক'রে একটুখানি স্নেহ উদ্রেক করবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করলুম "দাদা, ঘুমিয়েছেন কি?" হঠাৎ নিতান্ত বিজাতীয় মোটা গলায় কে একজন হুঙ্কার দিয়ে উঠল "হুজ ড্যাট্!" আমি বললুম "বাস্‌রে! এ তো দাদা নয়!" তৎক্ষণাৎ বিনীত অনুতপ্তস্বরে জ্ঞাপন করলুম "ক্ষমা করবেন, দৈবক্রমে ভুল কুঠরিতে প্রবেশ করেছি।" অপরিচিত কণ্ঠ বললে "অল্ রাইট্!" কম্বলটি পুনশ্চ তুলে নিয়ে কাতর শরীরে সঙ্কুচিত চিত্তে বেরোতে গিয়ে দেখি দরজা খুঁজে পাইনে। বাক্স তোরঙ্গ লাঠি বিছানা প্রভৃতি বিচিত্র জিনিষের মধ্যে খট্ খট্ শব্দে হাত্‌ড়ে বেড়াতে লাগলুম। ইঁদুর কলে পড়লে তার মানসিক ভাব কী রকম হয় এই অবসরে কতকটা বুঝতে পারা যেত, কিন্তু তার সঙ্গে সমুদ্রপীড়ার সংযোগ হওয়াতে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত জটিল হয়ে পড়েছিল।

মন যতই ব্যাকুল হয়ে উঠছে শরীর ততই গলদ্‌ঘর্ম্ম এবং কণ্ঠাগত অন্তরিন্দ্রিয়ের আক্ষেপ উত্তরোত্তর অবাধ্য হয়ে উঠছে। অনুসন্ধানের পর যখন হঠাৎ মসৃণ চিক্কণ শ্বেতকাচ-নির্ম্মিত দ্বারকর্ণটি হাতে ঠেকল, তখন মনে হোলো এমন প্রিয়স্পর্শসুখ বহুকাল অনুভব করা হয় নি। দরজা খুলে' বেরিয়ে প'ড়ে নিঃসংশয়চিত্তে পরবর্ত্তী

ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত। গিয়েই দেখি, আলো জ্বল্‌ছে; কিন্তু মেজের উপর পরিত্যক্ত গাউন পেটিকোট প্রভৃতি স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ বিক্ষিপ্ত। আর অধিক কিছু দৃষ্টিপথে পড়বার পূর্ব্বেই পলায়ন করলুম। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বারবার তিনবার ভ্রম করবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু তৃতীয়বার পরীক্ষা করতে সাহস হোলো না। এবং সেরূপ শক্তিও ছিল না। অবিলম্বে জাহাজের ছাতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেখানে বিহ্বলচিত্তে জাহাজের কাঠরার পরে ঝুঁকে পড়ে শরীরমনের একান্ত উদ্বেগ কিঞ্চিৎ লাঘব করা গেল। তার পরে বহুলাঞ্ছিত অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে কম্বলটি গুটিয়ে তার উপর লজ্জিত নতমস্তক স্থাপন ক'রে একটি কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লুম।

কী সর্ব্বনাশ! এ কার কম্বল! এ তো আমার নয় দেখছি! যে সুখসুপ্ত বিশ্বস্ত ভদ্রলোকটির ঘরের মধ্যে রাত্রে প্রবেশ ক'রে কয়েক মিনিট ধ'রে অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলুম নিশ্চয় এ তারই। একবার ভাবলুম ফিরে গিয়ে চুপিচুপি তার কম্বল স্বস্থানে রেখে আমারটি নিয়ে আসি; কিন্তু যদি তার ঘুম ভেঙে যায়! পুনর্ব্বার যদি তার ক্ষমা প্রার্থনা করবার প্রয়োজন হয় তবে সে কি আর আমাকে বিশ্বাস করবে! যদি বা করে, তবু এক রাত্রের মধ্যে দুবার ক্ষমা প্রার্থনা করলে নিদ্রা-কাতর বিদেশীর খৃষ্টীয় সহিষ্ণুতার প্রতি অতিমাত্র উপদ্রব করা হবে না কি!—আরো একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হোলো। দৈববশত দ্বিতীয়বার যে ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে পড়েছিলুম তৃতীয়বারও যদি ভ্রমক্রমে সেইখানে গিয়েই উপস্থিত হই এবং প্রথম ক্যাবিনের ভদ্রলোকটির কম্বলটি সেখানে রেখে সেখানকার একটি গাত্রাচ্ছাদন তুলে নিয়ে আসি তাহোলে কী রকমের একটা রোমহর্ষণ প্রমাদ-প্রহেলিকা

উপস্থিত হয়! ইত্যাকার দুশ্চিন্তায় তীব্র তাম্রকূটবাসিত পরের কম্বলের উপর কাষ্ঠাসনে রাত্রি যাপন করলুম।

২৩ আগষ্ট। আমার স্বদেশীয় সঙ্গী বন্ধুটি সমস্ত রাত্রির সুখনিদ্রা-বসানে প্রাতঃকালে অত্যন্ত প্রফুল্ল পরিপুষ্ট সুস্থ মুখে ডেকের উপর দর্শন দিলেন। আমি তাঁর দুই হস্ত চেপে ধরে বললুম,"ভাই, আমার তো এই অবস্থা!'—শুনে তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তির উপর কলঙ্ক আরোপ ক'রে হাস্য-সহকারে এমন দুটো একটা বিশেষণ প্রয়োগ করলেন যা গুরুমশায়ের সান্নিধ্য পরিত্যাগের পর থেকে আর কখনো শোনা হয় নি। সমস্ত রজনীর দুঃখের পর প্রভাতের এই অপমানটাও নিরুত্তরে সহ্য করলুম। অবশেষে তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমার ক্যাবিনের ভৃত্যটিকে ডেকে দিলেন। তাকেও আবার একে একে সমস্ত ঘটনাটি খুলে বলতে হোলো। প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারলে না, মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার জীবনের অভিজ্ঞতায় নিঃসন্দেহ এরকম ঘটনা এই প্রথম। অবশেষে ধীরে ধীরে সে সমুদ্রের দিকে একবার মুখ ফেরালে এবং ঈষৎ হাসলে; তার পর চলে গেল।

সী-সিক্‌নেস্ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। সে ব্যাধিটার যন্ত্রণা অনভিজ্ঞ স্থলচরদের কিছুতে বোঝানো যেতে পারে না। নাড়িতে ভারতবর্ষের অন্ন তিলমাত্র অবশিষ্ট রইল না। য়ুরোপে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে সমুদ্র এই দেহ হতে ভারতবর্ষটাকে যেন ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে একেবারে সাফ ক'রে ফেলবার চেষ্টা করছে। ক্যাবিনে চার দিন পড়ে আছি।

২৬ আগষ্ট। শনিবার থেকে আর আজ এই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত কেটে গেল। জগতে ঘটনা বড়ো কম হয়নি—সূর্য্য চারবার উঠেছে এবং তিনবার অস্ত গেছে; বৃহৎ পৃথিবীর অসংখ্য জীব দন্তধাবন থেকে দেশ

উদ্ধার পর্য্যন্ত বিচিত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন মহা ব্যস্তভাবে অতিবাহিত করেছে—জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড়ো বড়ো ব্যাপার সবেগে চলছিল—কেবল আমি শয্যাগত জীবন্মৃত হয়ে পড়ে ছিলুম। আধুনিক কবিরা কখনও মুহূর্ত্তকে অনন্ত কখনও অনন্তকে মুহূর্ত্ত আখ্যা দিয়ে প্রচলিত ভাষাকে নানাপ্রকার বিপরীত ব্যায়াম বিপাকে প্রবৃত্ত করান। আমি আমার এই চারটে দিনকে বড়ো রকমের একটা মুহূর্ত্ত বলব, না এর প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে একটা যুগ বলব স্থির করতে পারছিনে।

যাই হোক কষ্টের সীমা নেই। মানুষের মতো এত বড়ো একটা উন্নত জীব যে সহসা এতটা উৎকট দুঃখ ভোগ করে তার একটা মহৎ নৈতিক কিম্বা আধ্যাত্মিক কারণ থাকাই উচিত ছিল; কিন্তু জলের উপরে কেবল খানিকটা ঢেউ ওঠার দরুণ জীবাত্মার এতবেশি পীড়া নিতান্ত অন্যায় অসঙ্গত এবং অগৌরবজনক ব'লে বোধ হয়। কিন্তু জাগতিক নিয়মের প্রতি দোষারোপ ক'রে কোনো সুখ নেই, কারণ, সে নিন্দাবাদে কারো গায়ে কিছু ব্যথা বাজে না এবং জগৎ-রচনার তিলমাত্র সংশোধন হয় না।

যন্ত্রণাশয্যায় অচেতনপ্রায় ভাবে প'ড়ে আছি। কখনো কখনো ডেকের উপর থেকে পিয়নোর সঙ্গীত মৃদু মৃদু কর্ণে এসে প্রবেশ করে, তখন স্মরণ হয়, আমার এই সঙ্কীর্ণ শয়ন-কারাগারে বাইরে সংসারের নিত্য আনন্দস্রোত সমভাবে প্রবাহিত হচ্চে। বহুদূরে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমায় আমার সেই সঙ্গীতধ্বনিত স্নেহমধুর গৃহ মনে পড়ে। সুখস্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যময় জীবজগৎকে অতিদূরবর্ত্তী ছায়ারাজ্যের মতো বোধ হয়। মধ্যের এই সুদীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম ক'রে কখন সেখানকার জীবন-উৎসবের মধ্যে ফিরে যেতে পারব, এই কথাই কেবল ভাবি। মঙ্গলবার

প্রাতে যখন শরীরের মধ্যে প্রাণটা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, তখন আমার বন্ধু অনেক আশ্বাস দিয়ে আমাকে জাহাজের ছাদের উপর নিয়ে গেলেন। সেখানে লম্বা বেতের চৌকিটির উপর পা ছড়িয়ে ব'সে পুনর্ব্বার এই মর্ত্ত্য পৃথিবীর স্পর্শ এবং নবজীবনের আস্বাদ লাভ করা গেল।

জাহাজের যাত্রীদের বর্ণনা করতে চাইনে। অতি নিকট হতে কোনো মসীলিপ্ত লেখনীর সূচ্যগ্রভাগ যে তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য স্থাপন করতে পারে এ কথা তারা স্বপ্নেও না মনে ক'রে বেশ বিশ্বস্তচিত্তে ডেকের উপর বিচরণ করছে, টুংটাং শব্দে পিয়নো বাজাচ্চে, বাজি রেখে হার-জিৎ খেলছে, ধূমপানশালায় ব'সে তাস পিটচ্চে ; তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তিন বাঙালি তিন লম্বা চৌকিতে জাহাজের একটি প্রান্ত সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে অবশিষ্ট জনসংখ্যার প্রতি অত্যন্ত ঔদাস্যদৃষ্টিপাত ক'রে থাকি।

আমার সঙ্গী যুবকটির নিত্যকর্ম্ম হচ্চে তামাকের থলিটি বারবার হারানো, তার সন্ধান এবং উদ্ধারসাধন। আমি তাঁকে বারম্বার সতর্ক ক'রে দিয়েছি যে, যদি তাঁর মুক্তির কোনো ব্যাঘাত থাকে সে তাঁর চুরোট। মহর্ষি ভরত মৃত্যুকালেও হরিণশিশুর প্রতি চিত্তনিবেশ করেছিলেন ব'লে পরজন্মে হরিণশাবক হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। আমার সর্ব্বদাই আশঙ্কা হয়, আমার বন্ধু জন্মান্তরে ব্রহ্মদেশীয় কোনো এক কৃষকের কুটীরের সম্মুখে মস্ত একটা তামাকের ক্ষেত হয়ে উদ্ভূত হবেন। বিনা প্রমাণে তিনি শাস্ত্রের এ সকল কথা বিশ্বাস করেন না, বরঞ্চ তর্ক ক'রে আমারও সরল বিশ্বাস নষ্ট করতে চান এবং আমাকে পর্য্যন্ত চুরুট ধরাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হোতে পারেন নি।

২৭।২৮ আগষ্ট। দেবাসুরগণ সমুদ্র মন্থন ক'রে সমুদ্রের মধ্যে যা কিছু ছিল সমস্ত বাহির করেছিলেন। সমুদ্র দেবেরও কিছু করতে

পারলেন না, অসুরেরও কিছু করতে পারলেন না, হতভাগ্য দুর্ব্বল মানুষের উপর তার প্রতিশোধ তুলছেন। মন্দর-পর্ব্বত কোথায় জানিনে এবং শেষ নাগ তদবধি পাতালে বিশ্রাম করছেন, কিন্তু সেই সনাতন মন্থনের ঘূর্ণী-বেগ যে এখনো সমুদ্রের মধ্যে রয়ে গেছে তা নরজঠরধারী মাত্রেই অনুভব করেন। যাঁরা করেন না তাঁরা বোধ করি দেবতা অথবা অসুরবংশীয়। আমার বন্ধুটিও শেষোক্ত দলের, অর্থাৎ তিনিও করেন না।

রোগশয্যা ছেড়ে এখন "ডেকে" উঠে বসেছি। সম্পূর্ণ বললাভ হয় নি। শরীরের এই রকম অবস্থার মধ্যে একটু মাধুর্য্য আছে। এই সময়ে পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, সূর্য্যালোক সবসুদ্ধ সমস্ত বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে যেন একটি নূতন পরিচয় আরম্ভ হয়। তাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিছুকালের মতো বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আবার যেন নবপ্রেমিকের মতো উভয়ের মধ্যে মৃদু সলজ্জ মধুর ভাবে কথাবার্ত্তা জানাশোনার অল্প অল্প সূত্রপাত হোতে থাকে।

২৯ আগষ্ট। আজ রাত্রে এডেনে পৌঁছব। সেখানে কাল প্রাতে জাহাজ বদল করতে হবে। সমুদ্রের মধ্যে দুটি একটি ক'রে পাহাড় পর্ব্বতের রেখা দেখা যাচ্চে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। এডেন বন্দরে এসে জাহাজ থামল। আহারের পর রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হবার জন্যে আমরা দুই বন্ধু ছাতের একপ্রান্তে চৌকি দুটি সংলগ্ন ক'রে আরামে ব'সে আছি। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুগ্ধ পর্ব্বতবেষ্টিত তটচিত্র আমাদের আলস্য-বিজড়িত অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে স্বপ্ন-মরীচিকার মতো লাগছে।

এমন সময় শোনা গেল এখনি নূতন জাহাজে চড়তে হবে। সে জাহাজ আজ রাত্রেই ছাড়বে। ক্যাবিনের মধ্যে স্তূপাকার বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্র যেমন তেমন ক'রে চর্ম্মপেটকের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে

তার উপরে তিন চার জনে দাঁড়িয়ে নির্দ্দয় ভাবে নৃত্য ক'রে বহুকষ্টে চাবি বন্ধ করা গেল। ভৃত্যদের যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়ে ছোটো বড়ো মাঝারি নানা আকারের বাক্স তোরঙ্গ বিছানাপত্র বহন ক'রে নৌকারোহণপূর্ব্বক নূতন জাহাজ "ম্যাসীলিয়া" অভিমুখে চললুম।

অনতিদূরে মাস্তুলকণ্টকিত ম্যাসীলিয়া তার দীপালোকিত ক্যাবিন-গুলির সুদীর্ঘশ্রেণীবদ্ধ বাতায়ন উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়ে পৃথিবীর আদিম কালের অতিকায় সহস্রচক্ষু জলজন্তুর মতো স্থির সমুদ্রে জ্যোৎস্নালোকে নিস্তব্ধভাবে ভাসছে। সহসা সেখান থেকে ব্যাণ্ড বেজে উঠল। সঙ্গীতের ধ্বনিতে এবং নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নানিশীথে মনে হোতে লাগল, অর্দ্ধরাত্রে এই আরবের উপকূলে আরব্য উপন্যাসের মতো কী একটা মায়ার কাণ্ড ঘটবে।

ম্যাসীলিয়া অষ্ট্রেলিয়া থেকে যাত্রী নিয়ে আসছে। কুতূহলী নর-নারীগণ ডেকের বারান্দা ধরে সকৌতুকে নবযাত্রীসমাগম দেখছে। কিন্তু সে রাত্রে নূতনত্ব সম্বন্ধে আমাদেরই তিনজনের সব চেয়ে জিত। বহুকষ্টে জিনিষপত্র উদ্ধার ক'রে ডেকের উপর যখন উঠলুম মুহূর্ত্তের মধ্যে এক-জাহাজ দৃষ্টি আমাদের উপর বর্ষিত হোলো। যদি তার কোনো চিহ্ন দেবার ক্ষমতা থাকত তাহোলে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ কটা কালো ও নীল ছাপে ভরে যেত। জাহাজটি প্রকাণ্ড। তার সঙ্গীতশালা এবং ভোজনগৃহের ভিত্তি শ্বেত প্রস্তরে মণ্ডিত। বিদ্যুতের আলো এবং ব্যাণ্ডের বাদ্যে উৎসবময়।

অনেক রাত্রে জাহাজ ছেড়ে দিলে।

৩০ আগষ্ট। আমাদের এ জাহাজে ডেকের উপরে আর একটি দোতলা ডেকের মতো আছে। সেটি ছোটো এবং অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। সেইখানেই আমরা আশ্রয় গ্রহণ করলুম।

আমার বন্ধুটি নীরব এবং অন্যমনস্ক। আমিও তদ্রূপ। দূর সমুদ্র-তীরের পাহাড়গুলো রৌদ্রে ক্লান্ত এবং ঝাপসা দেখাচ্ছে, একটা মধ্যাহ্ন-তন্দ্রার ছায়া প'ড়ে যেন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

খানিকটা ভাবছি, খানিকটা লিখছি, খানিকটা ছেলেদের খেলা দেখছি। এ জাহাজে অনেকগুলি ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে আছে; আজকের দিনে যেটুকু চাঞ্চল্য সে কেবল তাদেরই মধ্যে। জুতো মোজা খুলে ফেলে তারা আমাদের ডেকের উপর কমলালেবু গড়িয়ে খেলা করছে—তাদের তিনটি দাসী বেঞ্চির উপরে ব'সে নতমুখে নিস্তব্ধভাবে শেলাই ক'রে যাচ্ছে, এবং মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে যাত্রীদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করছে।

বহুদূরে এক আধটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রে এক একটা পাহাড় জেগে উঠছে, অনুর্ব্বর কঠিন কালো দগ্ধ তপ্ত জনশূন্য। অন্যমনস্ক প্রহরীর মতো সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা উদাসীনভাবে তাকিয়ে আছে, সামনে দিয়ে কে আসছে কে যাচ্ছে তার প্রতি কিছু মাত্র খেয়াল নেই।

এইরকম ক'রে ক্রমে সূর্য্যাস্তের সময় হোলো। "কাস্‌ল্ অফ্ ইণ্ডোলেন্স্" অর্থাৎ কুঁড়েমির কেল্লা যদি কা'কেও বলা যায় সে হচ্চে জাহাজ। বিশেষত গরম দিনে, প্রশান্ত লোহিতসাগরের উপরে। যাত্রীরা সমস্ত বেলা ডেকের উপর আরাম কেদারায় প'ড়ে ভ্রূর উপরে টুপি টেনে দিয়ে দিবা-স্বপ্নে তলিয়ে রয়েছে। চলবার মধ্যে কেবল জাহাজ চলছে এবং তার দুই পাশের আহত নীল জল নাড়া পেয়ে অলস আপত্তির ক্ষীণ কলস্বরে পাশ কাটিয়ে কোনোমতে একটুখানি মাত্র সরে যাচ্ছে।

সূর্য্য অস্ত গেল। আকাশ এবং জলের উপরে চমৎকার রং দেখা

দিয়েছে। সমুদ্রের জলে একটি রেখামাত্র নেই। দিগন্তবিস্তৃত অটুট জলরাশি যৌবনপরিপূর্ণ পরিস্ফুট দেহের মতো একেবারে নিটোল এবং সুডোল। এই অপার অখণ্ড পরিপূর্ণতা আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত থমথম করছে। বৃহৎ সমুদ্র হঠাৎ যেন একটা জায়গায় এসে থেমেছে যার ঊর্দ্ধে আর গতি নেই, পরিবর্ত্তন নেই; যা অনন্তকাল অবিশ্রাম চাঞ্চল্যের পরম পরিণতি, চরম নির্ব্বাণ। সূর্য্যাস্তের সময় চিল আকাশের নীলিমার যে একটি সর্ব্বোচ্চ সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত বৃহৎ পাখা সমতলরেখায় বিস্তৃত ক'রে দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ ক'রে দেয়, চিরচঞ্চল সমুদ্র ঠিক যেন সহসা সেইরকম একটা পরম প্রশান্তির শেষ সীমায় এসে ক্ষণেকের জন্যে পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মুখ তুলে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। জলের যে বর্ণবিকাশ হয়েছে সে আকাশের ছায়া কি সমুদ্রের আলো ঠিক বলা যায় না। যেন একটা মাহেন্দ্রক্ষণে আকাশের নীরব নির্নিমেষ নীল নেত্রের দৃষ্টিপাতে হঠাৎ সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভার দীপ্তি স্ফূর্ত্তি পেয়ে তাকে অপূর্ব্ব মহিমান্বিত ক'রে তুলেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। ঢং ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজল। সকলে বেশভূষা পরিবর্ত্তন ক'রে সান্ধ্যভোজনের জন্যে সুসজ্জিত হোতে গেল। আধঘণ্টা পরে আবার ঘণ্টা। নরনারীগণ দলে দলে ভোজনশালায় প্রবেশ করলে। আমরা তিন বাঙালি একটি স্বতন্ত্র ছোটো টেবিল অধিকার ক'রে বসলুম। আমাদের সামনে আর একটি টেবিলে দুটি মেয়ে একটি উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে খেতে বসেছেন।

চেয়ে দেখলুম তাঁদের মধ্যে একটি যুবতী আপনার যৌবনশ্রী বহুল-পরিমাণে উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়ে সহাস্য মুখে আহার এবং আলাপে নিযুক্ত। তাঁর শুভ্র সুগোল সুচিক্কণ গ্রীবাবক্ষবাহুর উপর সমস্ত বিদ্যুৎ-

প্রদীপের অনিমেষ আলো এবং পুরুষমণ্ডলীর বিস্মিত সকৌতুক দৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। একটা অনাবৃত আলোক-শিখা দেখে দৃষ্টিগুলো যেন কালো পতঙ্গের মতো চারিদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লম্ফ দিয়ে পড়ছে। এমন কি অনেকে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করছে এবং তাই নিয়ে ঘরের সর্ব্বত্র একটা চাপা হাসির চাঞ্চল্য উঠেছে। অনেকেই সেই যুবতীর পরিচ্ছদটিকে "ইণ্ডেকোরাস্" ব'লে উল্লেখ করছে। কিন্তু আমাদের মতো বিদেশী লোকের পক্ষে তার বেআব্রু বেআদবিটা বোঝা একটু শক্ত। কারণ, নৃত্যশালায় এ রকম কিম্বা এর চেয়ে অনাবৃত বেশে গেলে কারো বিস্ময় উদ্রেক করে না।

কিন্তু বিদেশের সমাজনীতি সম্বন্ধে বেশি উৎসাহের সঙ্গে কিছু বলা ভালো নয়। আমাদের দেশে বাসরঘরে এবং কোনো কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে মেয়েরা যেমন অবাধে লজ্জাহীনতা প্রকাশ করে অন্য কোনো সভায় তেমন করলে সাধারণের কাছে দুষ্য হোত সন্দেহ নেই। সমাজে যেমন নিয়মের বাঁধাবাঁধি, তেমনি মাঝে মাঝে দুটো একটা ছুটিও থাকে।

৩১ আগষ্ট। আজ রবিবার। প্রাতঃকালে উঠে উপরের ডেকে চৌকিতে বসে সমুদ্রের বায়ু সেবন করছি, এমন সময় নিচের ডেকে খৃষ্টানদের উপাসনা আরম্ভ হোলো। যদিও জানি এদের মধ্যে অনেকেই শুষ্কভাবে অভ্যস্ত মন্ত্র আউড়িয়ে কলটেপা আর্গিনের মতো গান গেয়ে যাচ্ছিল—কিন্তু তবু এই যে দৃশ্য—এই যে গুটিকতক চঞ্চল ছোটো ছোটো মনুষ্য অপার সমুদ্রের মাঝখানে স্থির বিনম্রভাবে দাঁড়িয়ে গম্ভীর সমবেত কণ্ঠে এক চির-অজ্ঞাত অনন্ত রহস্যের প্রতি ক্ষুদ্র মানব-হৃদয়ের ভক্তি উপহার প্রেরণ করছে, এ অতি আশ্চর্য্য।

কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ এক এক বার অট্টহাস্য শোনা গেল। গতরাত্রের সেই ডিনর-টেবিলের নায়িকাটি উপাসনায় যোগ না দিয়ে

উপরের ডেকে বসে তাঁরি একটি উপাসক যুবকের সঙ্গে কৌতুকালাপে নিমগ্ন আছেন। মাঝে মাঝে উচ্চহাস্য করে উঠ্‌ছেন, আবার মাঝে মাঝে গুন্ গুন্ স্বরে ধর্ম্মসঙ্গীতেও যোগ দিচ্চেন।

আজ আহারের সময় একটি নূতন সংবাদের সৃষ্টি করা গেছে। ছোটো টেবিলটিতে আমরা তিন জনে ব্রেক্‌ফাষ্ট খেতে বসেছি। একটা শক্ত গোলাকার রুটির উপরে ছুরি চালনা করতে গিয়ে ছুরিটা সবলে পিছলে আমার বাম হাতের দুই আঙুলের উপর এসে পড়ল। রক্ত চারদিকে ছিট্‌কে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আহারে ভঙ্গ দিয়ে ক্যাবিনে পলায়ন করলুম। ইতিহাসে অনেক রক্তপাত লিপিবদ্ধ হয়েছে—আমার ডায়ারিতে আমার এই রক্তপাত লিখে রাখলুম;—ভাবী বঙ্গবীরদের কাছে গৌরবের প্রার্থী নই, বর্ত্তমান বঙ্গাঙ্গনাদের মধ্যে কেউ যদি একবার "আহা" বলেন।

১ সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যার পর আহারান্তে উপরের ডেকে আমাদের যথাস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। মৃদু শীতল বায়ুতে আমার বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং দাদা অলসভাবে ধূমসেবন করছেন, এমন সময়ে নিচের ডেকে নাচের বাজনা বেজে উঠল। সকলে মিলে' জুড়ি জুড়ি ঘূর্ণনৃত্য আরম্ভ হোলো।

তখন পূর্ব্বদিকে নব কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণপ্রায় চন্দ্র ধীরে ধীরে সমুদ্রশয়ন থেকে উঠে আসছে। এই তীররেখাশূন্য জলময় মহামরুর পূর্ব্বসীমান্তে উদয়পথের ঠিক নিচে থেকে আমাদের জাহাজ পর্য্যন্ত অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিক্‌মিক্ করছে। জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা কোন এক অলৌকিক বৃন্তের উপরে অপূর্ব্ব শুভ্র রজনীগন্ধার মতো আপন প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে নিঃশব্দে চতুর্দ্দিকে দলপ্রসারণ করল। আর মানুষগুলো পরস্পরকে জড়াজড়ি ক'রে ধরে পাগলের মতো তীব্র আমোদে ঘুরপাক খাচ্চে, হাঁপাচ্চে, উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

৩ সেপ্টেম্বর। বেলা দশটার সময় সুয়েজখালের প্রবেশমুখে এসে জাহাজ থাম্‌ল। চারিদিকে চমৎকার রঙের খেলা। পাহাড়ের উপর রৌদ্র, ছায়া এবং নীলিমবাষ্প। ঘননীল সমুদ্রের প্রান্তে বালুকাতীরের রৌদ্রদুঃসহ গাঢ় পীত রেখা।

খালের মধ্যে দিয়ে জাহাজ সমস্ত দিন অতি ধীরগতিতে চলছে। দুধারে তরুহীন বালুকা। কেবল মাঝে মাঝে এক একটি ছোটো কোঠাঘর বহুযত্নবর্দ্ধিত গুটিকতক গাছে-পালায় বেষ্টিত হয়ে আরামজনক দেখাচ্চে।

অনেক রাতে আধখানা চাঁদ উঠল। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দুই তীর অস্পষ্ট ধূ ধূ করছে।—রাত দুটো তিনটের সময় জাহাজ পোর্টসৈয়েদে নোঙর করলে।

৪ সেপ্টেম্বর। এখন আমরা ভূমধ্যসাগরে, য়ুরোপের অধিকারের মধ্যে। বাতাসও শীতল হয়ে এসেছে, সমুদ্রও গাঢ়তর নীল। আজ রাত্রে আর ডেকের উপর শোওয়া হোলো না।

৫ সেপ্টেম্বর। বিকালের দিকে ক্রীট্ দ্বীপের তটপর্ব্বত দেখা দিয়েছিল। ডেকের উপর একটা ষ্টেজ্ বাঁধা হচ্চে। জাহাজে একদল নাট্য ব্যবসায়ী যাত্রী আছে তারা অভিনয় করবে। অন্যদিনের চেয়ে সকাল সকাল ডিনর খেয়ে নিয়ে তামাসা আরম্ভ হোলো। প্রথমে যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা গানবাজনা কিঞ্চিৎ জানেন এবং জানেন না, তাঁদের কারো বা দুর্ব্বল পিয়নো টিং টিং কারো বা মৃদু ক্ষীণকণ্ঠে গান হোলো। তার পরে যবনিকা উদ্‌ঘাটন ক'রে নটনটী কর্ত্তৃক "ব্যালে" নাচ, সং নিগ্রোর গান, জাদু, প্রহসন অভিনয় প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক হয়েছিল। মধ্যে নাবিকাশ্রমের জন্যে দর্শকদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ হোলো।

৬ সেপ্টেম্বর। খাবার ঘরে খোলা জানলার কাছে বসে বাড়িতে চিঠি লিখছি। একবার মুখ তুলে বামে চেয়ে দেখলুম "আয়োনিয়ান্" দ্বীপ দেখা দিয়েছে। পাহাড়ের কোলের মধ্যে সমুদ্রের ঠিক ধারেই মনুষ্যরচিত ঘনসন্নিবিষ্ট একটি শ্বেত মৌচাকের মতো দেখা যাচ্চে। এইটি জান্তিসহর (Zanthe)। দূর থেকে মনে হচ্চে যেন পর্ব্বতটা তা'র প্রকাণ্ড করপুটে কতকগুলো শ্বেত পুষ্প নিয়ে সমুদ্রকে অঞ্জলি দেবার উপক্রম করছে।

ডেকের উপর উঠে দেখি আমরা দুই শৈলশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথে চলেছি। আকাশে মেঘ ক'রে এসেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, ঝড়ের সম্ভাবনা। আমাদের সর্ব্বোচ্চ ডেকের চাঁদোয়া খুলে ফেলে দিলে। পর্ব্বতের উপর অত্যন্ত নিবিড় মেঘ নেমে এসেছে ; কেবল দূরে একটিমাত্র পাহাড়ের উপর মেঘছিদ্রমুক্ত সন্ধ্যালোকের একটি দীর্ঘ আরক্ত ইঙ্গিত এসে স্পর্শ করেছে, অন্য সবগুলো আসন্ন ঝটিকার ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু ঝড় এল না। একটু প্রবল বাতাস এবং সবেগ বৃষ্টির উপর দিয়েই সমস্ত কেটে গেল। ভূমধ্যসাগরে আকাশের অবস্থা অত্যন্ত অনিশ্চিত। শুনলুম, আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্চি এখান দিয়ে জাহাজ সচরাচর যায় না। জায়গাটা নাকি ভারি ঝোড়ো।

রাত্রে ডিনরের পর যাত্রীরা কাপ্তেনের স্বাস্থ্যপান এবং গুণগান করলে। কাল ব্রিন্দিশি পৌছব। জিনিষপত্র বাঁধতে হবে।

৭ সেপ্টেম্বর। আজ সকালে ব্রিন্দিশি পৌছন গেল। মেলগাড়ি প্রস্তুত ছিল, আমরা গাড়িতে উঠলুম।

গাড়ি যখন ছাড়ল তখন টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আহার ক'রে এসে একটি কোণে জানলার কাছে বসা গেল।

প্রথমে, দুইধারে কেবল আঙুরের ক্ষেত। তার পরে জলপাইয়ের

বাগান। জলপাইয়ের গাছগুলো নিতান্ত বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটল-বিশিষ্ট, বলি-অঙ্কিত, বেঁটেখাটো রকমের ; পাতাগুলো ঊর্দ্ধমুখ ; প্রকৃতির হাতের কাজে যেমন একটি সহজ অনায়াসের ভাব দেখা যায়, এই গাছগুলোয় তার বিপরীত। এরা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া, কায়ক্লেশে অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; এক একটা এমন বেঁকে ঝুঁকে পড়েছে যে পাথর উঁচু ক'রে তাদের ঠেকো দিয়ে রাখতে হয়েছে।

বামে চষা মাঠ ; শাদা শাদা ভাঙা ভাঙা পাথরের টুক্‌রো চষা মাটির মধ্যে মধ্যে উৎক্ষিপ্ত। দক্ষিণে সমুদ্র। সমুদ্রের একেবারে ধারেই এক একটি ছোটো ছোটো সহর দেখা দিচ্চে। চর্চ্চচূড়া-মুকুটিত শাদা ধব্‌ধবে নগরীটি একটি পরিপাটি তন্বী নাগরীর মতো কোলের কাছে সমুদ্র-দর্পণ রেখে নিজের মুখ দেখে হাসছে। নগর পেরিয়ে আবার মাঠ। ভুট্টার ক্ষেত, আঙুরের ক্ষেত, ফলের ক্ষেত, জলপাইয়ের বন ; ক্ষেতগুলি খণ্ড প্রস্তরের বেড়া দেওয়া। মাঝে মাঝে এক একটি বাঁধা কূপ। দূরে দূরে দুটো একটা সঙ্গীহীন ছোটো শাদা বাড়ি।

সূর্য্যাস্তের সময় হয়ে এল। আমি কোলের উপর এক থোলো আঙুর নিয়ে বসে বসে এক আধটা করে মুখে দিচ্চি। এমন মিষ্ট টস্‌টসে, সুগন্ধ আঙুর ইতিপূর্ব্বে কখনো খাইনি। মাথায় রঙীন্ রুমাল বাঁধা ঐ ইতালীয়া যুবতীকে দেখে আমার মনে হচ্চে, ইতালীয়ানীরা এখানকার আঙুরের গুচ্ছের মতো, অম্‌নি একটি বৃন্তভরা অজস্র সুডোল সৌন্দর্য্য, যৌবনরসে অম্‌নি উৎপূর্ণ,—এবং ঐ আঙুরেরই মতো তাদের মুখের রং —অতি বেশি সাদা নয়।

এখন একটা উচ্চ সমুদ্রতটের উপর দিয়ে চলেছি। আমাদের ঠিক নিচেই ডানদিকে সমুদ্র। ভাঙাচোরা জমি ঢালু হয়ে জলের মধ্যে প্রবেশ করেছে। গোটা চার পাঁচ পাল-মোড়া নৌকো ডাঙার উপর

তোলা। নিচেকার পথ দিয়ে গাধার উপর চড়ে লোক চলেছে। সমুদ্রতীরে কতকগুলো গরু চরছে—কী খাচ্চে ওরাই জানে ;—মাঝে মাঝে কেবল কতকগুলো শুকনো খড়কের মতো আছে মাত্র।

রাত্রে আমরা গাড়ির ভোজনশালায় ডিনরে বসেছি, এমন সময়ে গাড়ি একটা ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। একদল নরনারী প্ল্যাটফর্ম্মে ভীড় করে বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের ভোজ দেখতে লাগল। তারি মধ্যে গ্যাসের আলোকে দুটি একটি সুন্দর মেয়ের মুখ দেখা যাচ্ছিল, তাতে ক'রে ভোজনপাত্র থেকে আমাদের চিত্তকে অনেকটা পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করছিল। ট্রেন ছাড়বার সময় আমাদের সহযাত্রীগণ তাদের প্রতি অনেক টুপি রুমাল আন্দোলন, অনেক চুম্বন-সঙ্কেত প্রেরণ, তারস্বরে অনেক উল্লাসধ্বনি প্রয়োগ করলে ; তারাও গ্রীবা আন্দোলনে আমাদের প্রত্যভিবাদন করতে লাগল।

৮ সেপ্টেম্বর। কাল আড্রিয়াটিকের সমতল শ্রীহীন তীরভূমি দিয়ে আসছিলুম, আজ শস্যশ্যামলা লম্বার্ডির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলছে। চারিদিকে আঙুর, জলপাই, ভুট্টা ও তুঁতের ক্ষেত। কাল যে আঙুরের লতা দেখা গিয়েছিল সেগুলো ছোটো ছোটো গুল্মের মতো। আজ দেখছি, ক্ষেতময় লম্বা লম্বা কাঠি পোঁতা, তারি উপর ফলগুচ্ছপূর্ণ দ্রাক্ষালতা লতিয়ে উঠেছে।

ক্রমে পাহাড় দেখা দিচ্চে। পাহাড়গুলি উপর থেকে নিচে পর্য্যন্ত দ্রাক্ষাদণ্ডে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে, তারি মাঝখানে এক একটি লোকালয়।

রেলের লাইনের ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কুটীর ; এক হাতে তারি একটি দুয়ার ধ'রে এক হাত কোমরে দিয়ে একটি ইতালিয়ান যুবতী সকৌতুক কৃষ্ণনেত্রে আমাদের গাড়ির গতি নিরীক্ষণ

করছে। অনতিদূরে একটি বালিকা একটা প্রখরশৃঙ্গ প্রকাণ্ড গরুর গলার দড়িটি ধরে নিশ্চিন্তমনে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে। তার থেকে আমাদের বাংলা দেশের নব দম্পতির চিত্র মনে পড়ল। মস্ত একটা চষমা-পরা গ্র্যাজুয়েট্-পুঙ্গব, এবং তারি দড়িটা ধরে ছোটো একটি চোদ্দ পনেরো বৎসরের নোলকপরা নববধূ; জন্তুটি দিব্যি পোষ মেনে চরে বেড়াচ্চে, এবং মাঝে মাঝে বিস্ফারিত নয়নে কর্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করছে।

ট্যুরিন্ ষ্টেশনে আসা গেল। এ দেশের সামান্য পুলিসম্যানের সাজ দেখে অবাক্ হোতে হয়। মস্ত চূড়াওয়ালা টুপি, বিস্তর জরিজরাও, লম্বা তলোয়ার,—সকল ক'টিকেই সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র ব'লে মনে হয়।

দক্ষিণে বামে তুষাররেখাঙ্কিত সুনীল পর্ব্বতশ্রেণী। বামে ঘনচ্ছায়া-স্নিগ্ধ অরণ্য। যেখানে অরণ্যের একটু বিচ্ছেদ পাওয়া যাচ্চে সেই-খানেই শস্যক্ষেত্র তরুশ্রেণী ও পর্ব্বতসমেত এক একটা নব নব আশ্চর্য্য দৃশ্য খুলে যাচ্চে। পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর পুরাতন দুর্গশিখর, তলদেশে এক একটি ছোটো ছোটো গ্রাম। যত এগোচ্চি অরণ্যপর্ব্বত ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে যে গ্রামগুলি আসছে সেগুলি তেমন উদ্ধত শুভ্র নবীন পরিপাটি নয়; একটু যেন ম্লান দরিদ্র নিভৃত; একটি আধটি চর্চ্চের চূড়া আছে মাত্র; কিন্তু কল কারখানার ধূমোদ্গারী বৃংহিতধ্বনিত ঊর্দ্ধমুখী ইষ্টকশুণ্ড নেই।

ক্রমে অল্পে অল্পে পাহাড়ের উপরে ওঠা যাচ্চে। পার্ব্বত্যপথ সাপের মত এঁকে বেঁকে চলেছে; ঢালু পাহাড়ের উপর চষাক্ষেত সোপানের মতো থাকে থাকে উঠেছে। একটি গিরিনদী স্বচ্ছ সফেন জলরাশি নিয়ে সঙ্কীর্ণ উপলপথ দিয়ে ঝরে পড়ছে।

গাড়িতে আলো দিয়ে গেল। এখনি মণ্ট্ সেনিসের বিখ্যাত দীর্ঘ

রেলোয়ে-সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে গহ্বরটি উত্তীর্ণ হোতে প্রায় আধঘণ্টা লাগল।

এইবার ফ্রান্স। দক্ষিণে এক জলস্রোত ফেনিয়ে ফেনিয়ে চলেছে। ফরাসী জাতির মতো দ্রুত চঞ্চল উচ্ছ্বসিত হাস্যপ্রিয় কলভাষী।

ফ্রান্সের প্রবেশদ্বারে একবার একজন কর্ম্মচারী গাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করে গেল আমাদের মাশুল দেবার যোগ্য জিনিষ কিছু আছে কি না—আমরা বললুম, না। আমাদের একজন বৃদ্ধ সহযাত্রী ইংরাজ বলেন, I don't parlez-vous francaise.

সেই স্রোত এখনো আমাদের ডান দিক দিয়ে চলেছে। তার পূর্ব্বতীরে "ফার্" অরণ্য নিয়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চলা নির্ঝরিণী বেঁকে চুরে ফেনিয়ে ফুলে' নেচে কলরব ক'রে পাথরগুলোকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঠেলে রেলগাড়ির সঙ্গে সমান দৌড় দিয়েছে। মাঝে মাঝে একটা লোহার সাঁকো-মুষ্টি দিয়ে তা'র ক্ষীণ কটিদেশ পরিমাপ করবার চেষ্টা করছে। এক জায়গায় জলরাশি খুব সঙ্কীর্ণ; দুই তীরের শ্রেণীবদ্ধ দীর্ঘ বৃক্ষগুলি শাখায় শাখায় বেষ্টন ক'রে দুরন্ত স্রোতকে অন্তঃপুরে বন্দী করতে বৃথা চেষ্টা করছে। উপর থেকে ঝরণা এসে সেই প্রবাহের সঙ্গে মিশছে। বরাবর পূর্ব্বতীর দিয়ে একটি পার্ব্বত্য পথ সমরেখায় স্রোতের সঙ্গে বেঁকে চলে গেছে। এক জায়গায় আমাদের সহচরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হোলো। হঠাৎ সে দক্ষিণ থেকে বামে এসে এক অজ্ঞাত সঙ্কীর্ণ শৈলপথে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে এক একটা পাহাড় তৃণহীন সহস্র রেখাঙ্কিত পাষাণ-কঙ্কাল প্রকাশ ক'রে নগ্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে; কেবল তা'র মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় খানিকটা ক'রে অরণ্যের খণ্ড আবরণ রয়েছে। প্রচণ্ড সংগ্রামে একটা দৈত্য সহস্র সহস্র নখের

বিদারণরেখা রেখে যেন ওর শ্যামল ত্বক্ অনেকখানি ক'রে আঁচড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে।

আবার হঠাৎ ডান দিকে আমাদের সেই পূর্ব্বসঙ্গিনী মুহূর্ত্তের জন্যে দেখা দিয়ে বামে চলে গেল। একবার দক্ষিণে একবার বামে, একবার অন্তরালে। আবার হয়তো যেতে যেতে কোন্ এক পর্ব্বতের আড়াল থেকে সহসা কলহাস্যে করতালি দিয়ে আচম্‌কা দেখা দেবে।

সেই জলপাই এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ অনেক কমে গেছে। বিবিধ শস্যের ক্ষেত্র এবং দীর্ঘ সরল পপ্লার গাছের শ্রেণী। ভুট্টা, তামাক, নানাবিধ শাক সব্‌জি। কেবলি যেন বাগানের পর বাগান। এই কঠিন পর্ব্বতের মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে বহু যত্নে প্রকৃতিকে বশ ক'রে তার উচ্ছৃঙ্খলতা হরণ করেছে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপর মানুষের কত প্রয়াস প্রকাশ পাচ্চে। এদেশের লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালোবাসবে তাতে কিছু আশ্চর্য্য নেই। এরা আপনার দেশকে আপনার যত্নে আপনার ক'রে নিয়েছে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে আসছে, উভয়ের মধ্যে ক্রমিক আদান প্রদান চলছে, তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। একদিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে আর একদিকে বৈরাগ্যবৃদ্ধ মানব উদাসীনভাবে শুয়ে—য়ুরোপের সে ভাব নয়। এদের এই সুন্দরী ভূমি এদের একান্ত সাধনার ধন,এ'কে এরা নিয়ত বহু আদর ক'রে রেখেছে। এর জন্যে যদি প্রাণ না দেবে তো কিসের জন্যে দেবে! এই প্রেয়সীর প্রতি কেউ তিলমাত্র হস্তক্ষেপ করলে কি আর সহ্য হয়? আমরা তো জঙ্গলে থাকি; খাল বিল বন বাদাড় ভাঙারাস্তা এবং পানাপুকুরের ধারে বাস করি। ক্ষেত থেকে দুমুঠো ধান আনি, মেয়েরা আঁচল ভরে শাক তুলে নিয়ে আসে, ছেলেরা পাঁকের মধ্যে নেমে চিংড়িমাছ ধরে

আনে, প্রাঙ্গণের গাছ থেকে গোটাকতক তেঁতুল পাড়ি, তার পরে শুক্‌নো কাঠকুট্‌ সংগ্রহ ক'রে একবেলা অথবা দুবেলা কোনো রকম ক'রে আহার চলে যায়; ম্যালেরিয়া এসে যখন জীর্ণ অস্থিকঙ্কাল কাঁপিয়ে তোলে তখন কাঁথা মুড়ি দিয়ে রৌদ্রে পড়ে থাকি, গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় পঙ্ককুণ্ডের হরিদ্বর্ণ জলাবশেষ থেকে উঠে এসে ওলাওঠা যখন আমাদের গৃহ আক্রমণ করে তখন ওলাদেবীর পূজা দিই, এবং অদৃষ্টের দিকে কোটর-প্রবিষ্ট হতাশ শূন্যদৃষ্টি বদ্ধ ক'রে দল বেঁধে মরতে আরম্ভ করি। আমরা কি আমাদের দেশকে পেয়েছি না পেতে চেষ্টা করেছি? আমরা ইহলোকের প্রতি ঔদাস্য ক'রে এখানে কেবল অনিচ্ছুক পথিকের মতো যেখানে সেখানে পড়ে থাকি এবং যত শীঘ্র পারি দ্রুতবেগে বিশ পঁচিশটা বৎসর ডিঙিয়ে একেবারে পরলোকে গিয়ে উপস্থিত হই।

কিন্তু এ কী চমৎকার চিত্র! পর্ব্বতের কোলে, নদীর ধারে, হ্রদের তীরে পপ্লর-উইলোবেষ্টিত কাননশ্রেণী। নিষ্কণ্টক নিরাপদ নিরাময় ফলশস্যপরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণে মানুষের ভালোবাসা পাচ্চে এবং মানুষকে দ্বিগুণ ভালোবাসছে। মানুষের মতো জীবের এইতো যোগ্য আবাসস্থান। মানুষের প্রেম এবং মানুষের ক্ষমতা যদি আপনার চতুর্দ্দিককে সংযত সুন্দর সমুজ্জ্বল ক'রে না তুলতে পারে তবে তরুকোটর গুহাগহ্বর বনবাসী জন্তুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ কী?

৮ সেপ্টেম্বর। পথের মধ্যে আমাদের প্যারিসে নাববার প্রস্তাব হচ্চে। কিন্তু আমাদের এই ট্রেন প্যারিসে যায় না—একটু পাশ কাটিয়ে যায়। প্যারিসের একটি নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে স্পেশল ট্রেন্‌ প্রস্তুত রাখবার জন্যে টেলিগ্রাফ্‌ করা গেল।

রাত দু'টোর সময় আমাদের জাগিয়ে দিলে। ট্রেন্‌ বদল করতে হবে। জিনিষপত্র বেঁধে বেরিয়ে পড়লুম। বিষম ঠাণ্ডা। অনতিদূরে

আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে। কেবলমাত্র একটি এঞ্জিন্, একটি ফষ্টক্লাস এবং একটি ব্রেক্‌ভ্যান্। আরোহীর মধ্যে আমরা তিনটি ভারতবর্ষীয়। রাত তিনটের সময় প্যারিসের জনশূন্য বৃহৎ ষ্টেশনে পৌছন গেল। সুপ্তোত্থিত দুই একজন "মসিয়" আলো হস্তে উপস্থিত। অনেক হাঙ্গাম ক'রে নিদ্রিত কাষ্টম্ হৌস্‌কে জাগিয়ে তা'র পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম। তখন প্যারিস তা'র সমস্ত দ্বার রুদ্ধ ক'রে স্তব্ধ রাজপথে দীপশ্রেণী জ্বালিয়ে রেখে নিদ্রামগ্ন। আমরা হোটেল ট্যার্মিনুতে আমাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলুম। পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুদুজ্জ্বল, স্ফটিকমণ্ডিত, কার্পেটাবৃত, চিত্রিতভিত্তি, নীলযবনিকাপ্রচ্ছন্ন শয়নশালা; বিহগপক্ষসুকোমল শুভ্র শয্যা।

বেশ বদল ক'রে শয়নের উদ্যোগ করবার সময় দেখা গেল আমাদের জিনিষপত্রের মধ্যে আর এক জনের ওভারকোট্ গাত্রবস্ত্র। আমরা তিনজনেই পরস্পরের জিনিষ চিনিনে; সুতরাং হাতের কাছে যে-কোনো অপরিচিত বস্তু পাওয়া যায় সেইটেই আমাদের কারো-না-কারো স্থির ক'রে অসংশয়ে সংগ্রহ ক'রে আনি। অবশেষে নিজের নিজের জিনিষ পৃথক ক'রে নেবার পর উদ্বৃত্ত সামগ্রী পাওয়া গেলে, তা আর পূর্ব্বাধিকারীকে ফিরিয়ে দেবার কোনো সুযোগ থাকে না। ওভারকোট্‌টি রেলগাড়ি থেকে আনা হয়েছে; যার কোট্ সে বেচারা বিশ্বস্তচিত্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। গাড়ি এতক্ষণে সমুদ্রতীরস্থ ক্যালে নগরীর নিকটবর্ত্তী হয়েছে। লোকটি কে, এবং সমস্ত বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে তার ঠিকানা কোথায়, আমরা কিছুই জানিনে। মাঝের থেকে তার লম্বা কুর্ত্তি এবং আমাদের পাপের ভার স্কন্ধের উপর বহন ক'রে বেড়াচ্চি—প্রায়শ্চিত্তের পথ বন্ধ। মনে হচ্চে, একবার যে লোকটির কম্বল হরণ করেছিলুম এ কুর্ত্তিটি তার। সে বেচারা বৃদ্ধ, শীতপীড়িত, বাতে পঙ্গু, অ্যাংলো-

ইণ্ডিয়ন পুলিস অধ্যক্ষ। পুলিসের কাজ ক'রে মানবচরিত্রের প্রতি সহজেই তার বিশ্বাস শিথিল হয়ে এসেছে, তার পরে যখন কাল প্রত্যূষে ব্রিটিশ চ্যানেল পার হবার সময় তীব্র শীতবায়ু তার হৃতকুক্তি জীর্ণ দেহকে কম্পান্বিত ক'রে তুলবে তখন সেই সঙ্গে মনুষ্যজাতির সাধুতার প্রতিও তার বিশ্বাস কম্পিত হোতে থাকবে।

৯ সেপ্টেম্বর। প্রাতঃকালে দ্বিতীয়বার বেশ পরিবর্ত্তন করবার সময় দেখা গেল আমার বন্ধুর একটি পোর্টম্যাণ্টো পাওয়া যাচ্চে না।

পুলিসে সংবাদ দিয়ে প্রাতঃকালে তিনজনে প্যারিসের পথে পদব্রজে বেরিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড রাজপথ দোকান বাগান প্রাসাদ প্রস্তরমূর্ত্তি ফোয়ারা লোকজন গাড়িঘোড়ার মধ্যে অনেক ঘুরে ঘুরে এক ভোজন-গৃহের বিরাট স্ফটিকশালার প্রান্তটেবিলে ব'সে অল্প আহার ক'রে এবং বিস্তর মূল্য দিয়ে ঈফেল্ স্তম্ভ দেখতে গেলেম। এই লৌহস্তম্ভ চারি পায়ের উপরে ভর দিয়ে এক বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কলের দোলায় চ'ড়ে এই স্তম্ভের চতুর্থ তলায় উঠে নিম্নে সমস্ত প্যারিসটাকে খুব একটা বড়ো ম্যাপের মতো প্রসারিত দেখতে পেলুম।

বলা বাহুল্য, এমন ক'রে একদিনে তাড়াতাড়ি চক্ষু দ্বারা বহির্ভাগ লেহন ক'রে প্যারিসের রসাস্বাদন করা যায় না। এ যেন, ধনীগৃহের মেয়েদের মতো বদ্ধ পাল্কির মধ্যে থেকে গঙ্গাস্নান করার মতো—কেবল নিতান্ত তীরের কাছে একটা অংশে এক ডুবে যতখানি পাওয়া যায়। কেবল হাঁপানিই সার।

হোটেলে এসে দেখলুম পুলিসের সাহায্যে বন্ধুর পোর্টম্যাণ্টো ফিরে এসেছে, কিন্তু এখনো সেই পরের হৃতকোর্ত্তা সম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছি।

১০ সেপ্টেম্বর। লণ্ডন অভিমুখে চললুম। সন্ধ্যার সময় লণ্ডনে

পৌঁছে দুই-একটি হোটেল অন্বেষণ ক'রে দেখা গেল স্থানাভাব। অবশেষে একটি ভদ্র পরিবারের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

১১ সেপ্টেম্বর। সকালবেলায় আমাদের পুরাতন বন্ধুদের সন্ধানে বাহির হওয়া গেল।

প্রথমে, লণ্ডনের মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত বাড়ির দ্বারে গিয়ে আঘাত করা গেল। যে দাসী এসে দরজা খুলে দিলে তাকে চিনিনে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম আমার বন্ধু বাড়িতে আছেন কি না। সে বললে তিনি এ বাড়িতে থাকেন না। জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় থাকেন? সে বললে, আমি জানিনে, আপনারা ঘরে এসে বসুন, আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি। পূর্ব্বে যে ঘরে আমরা আহার করতুম সেই ঘরে গিয়ে দেখলেম সমস্ত বদল হয়ে গেছে—সেখানে টেবিলের উপর খবরের কাগজ এবং বই—সে ঘর এখন অতিথিদের প্রতীক্ষাশালা হয়েছে। খানিকক্ষণ বাদে দাসী একটি কার্ডে লেখা ঠিকানা এনে দিলে। আমার বন্ধু এখন লণ্ডনের বাইরে কোনো এক অপরিচিত স্থানে থাকেন। নিরাশ হৃদয়ে আমার সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরলুম।

আমাদের গাড়ি মিস্ শ—য়ের বাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়াল। গিয়ে দেখি তিনি নির্জ্জনগৃহে ব'সে একটি পীড়িত কুক্কুর শাবকের সেবায় নিযুক্ত। জল বায়ু, পরস্পরের স্বাস্থ্য এবং কালের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত শিষ্টালাপ করা গেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে, লণ্ডনের সুরঙ্গপথে যে পাতাল-বাষ্পযান চলে, তাই অবলম্বন ক'রে বাসায় ফেরবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু পরিণামে দেখতে পেলুম পৃথিবীতে সকল চেষ্টা সহজে সফল হয় না। আমরা দুই ভাই তো গাড়িতে চড়ে বেশ নিশ্চিন্ত ব'সে আছি; এমন সময়

গাড়ি যখন হ্যামারস্মিথ্ নামক দূরবর্ত্তী ষ্টেশনে গিয়ে থামল তখন আমাদের বিশ্বাসপরায়ণ চিত্তে ঈষৎ সংশয়ের সঞ্চার হোলো। এক-জনকে জিজ্ঞাসা করাতে সে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে আমাদের গম্যস্থান যেদিকে এ গাড়ির গম্যস্থান সেদিকে নয়। পুনর্ব্বার তিনচার ষ্টেশন ফিরে গিয়ে গাড়ি বদল করা আবশ্যক। তাই করা গেল। অবশেষে গম্য ষ্টেশনে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে আমাদের বাসা খুঁজে পাইনে। বিস্তর গবেষণার পর বেলা সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা টিফিন খাওয়া গেল। এইটুকু আত্মজ্ঞান জন্মেছে যে, আমরা দুটি ভাই লিভিংষ্টোন অথবা ষ্টান্‌লির মতো ভৌগোলিক আবিষ্কার কার্য্যের যোগ্য নই; পৃথিবীতে যদি অক্ষয় খ্যাতি উপার্জ্জন করতে চাই তো নিশ্চয় অন্য কোনো দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

১২ সেপ্টেম্বর। আমাদের বন্ধুর একটি গুণ আছে তিনি যতই কল্পনার চর্চ্চা করুন না কেন, কখনো পথ ভোলেন না। সুতরাং তাঁকেই আমাদের লণ্ডনের পাণ্ডাপদে বরণ করেছি। আমরা যেখানে যাই তাঁকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাই, এবং তিনি যেখানে যান আমরা কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়িনে। কিন্তু একটা আশঙ্কা আছে এ রকম অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব এ পৃথিবীতে সকল সময় সমাদৃত হয় না। হায়! এ সংসারে কুসুমে কণ্টক, কলানাথে কলঙ্ক এবং বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ আছে—কিন্তু, ভাগ্যিস আছে!

১৫ সেপ্টেম্বর। স্যাভয় থিয়েটরে "গণ্ডোলিয়র্স" নামক একটি গীতিনাট্য অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম। আলোকে, সঙ্গীতে, সৌন্দর্য্যে, বর্ণবিন্যাসে, দৃশ্যে, নৃত্যে, হাস্যে, কৌতুকে মনে হোলো একটা কোন কল্পনারাজ্যে আছি। মাঝে এক অংশে অনেকগুলি নর্ত্তক নর্ত্তকীতে মিলে নৃত্য আছে; আমার মনে হোলো যেন হঠাৎ এক সময়ে একটা

উন্মাদকর যৌবনের বাতাসে পৃথিবী জুড়ে নরনারীর একটা উলট্ পালট্ ঢেউ উঠেছে—তাতে আলোক এবং বর্ণচ্ছটা, সঙ্গীত এবং উৎফুল্লনয়নের উজ্জ্বল হাসি সহস্র ভঙ্গীতে চারিদিকে ঠিকরে পড়ছে।

১৬ সেপ্টেম্বর। আজ আমাদের গৃহস্বামীর কুমারী কন্যা আমার কতকগুলি পুরাতন পূর্ব্বশ্রুত সুর পিয়নোয় বাজাচ্ছিলেন; তাই শুনে আমার গৃহ মনে পড়তে লাগল! সেই ভারতবর্ষের রৌদ্রালোকিত প্রাতঃকাল, মুক্ত বাতায়ন, অব্যাহত আকাশ এবং পিয়নো যন্ত্রে এই স্বপ্নবহ পরিচিত সঙ্গীতধ্বনি।

১৭ সেপ্টেম্বর। যে দুর্ভাগার শীতকোর্ত্তা আমরা বহন ক'রে ক'রে বেড়াচ্চি, ইণ্ডিয়া আপিস যোগে সে আমাদের একটি পত্র লিখেছে—আমরাই যে তার গাত্রবস্ত্রটি সংগ্রহ ক'রে এনেছি সে বিষয়ে পত্রলেখক নিজের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছে; তার সঙ্গে "ভ্রম ক্রমে" ব'লে একটা শব্দ যোগ ক'রে দিয়েছিল। একটা সন্তোষের বিষয় এই, যার কম্বল নিয়েছিলুম এটা তার নয়। ভ্রমক্রমে দুবার একজনের গরম কাপড় নিলে ভ্রম সপ্রমাণ করা কিছু কঠিন হোত।

১৯ সেপ্টেম্বর। এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই। শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন তো আমাকে ক্ষমা করবেন। নবনীর মতো সুকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুক্‌টুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা এবং দীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট নির্ম্মল নীলনেত্র; —দেখে প্রবাসদুঃখ দূর হয়ে যায়। শুভানুধ্যায়ীরা শঙ্কিত এবং চিন্তিত হবেন, প্রিয় বয়স্যেরা পরিহাস করবেন কিন্তু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে। সুন্দর হওয়া এবং মিষ্ট ক'রে হাসা মানবীয় যেন একটি পরমাশ্চর্য্য ক্ষমতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ভাগ্যক্রমে ঐ হাসিটা এদেশে কিছু বাহুল্যপরিমাণে পেয়ে

থাকি। অনেক সময়ে রাজপথে কোনো নীলনয়না পাষ্থরমণীর সম্মুখবর্ত্তী হবামাত্র সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সম্বরণ করতে পারে না। তখন তাকে ডেকে ব'লে দিতে ইচ্ছা করে, "সুন্দরি, আমি হাসি ভালোবাসি বটে, কিন্তু এতটা নয়। তা ছাড়া বিম্বাধর-সংলগ্ন হাসি যতই সুমিষ্ট হোক না কেন, তারো একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা চাই; কারণ, মানুষ কেবলমাত্র যে সুন্দর তা নয়, মানুষ বুদ্ধিমান জীব। হে নীলাঞ্জনয়নে, আমি তো ইংরেজের মতো অসভ্য খাটো কুর্ত্তি এবং অসঙ্গত লম্বা ধুচুনি টুপি পরিনে, তবে হাসো কী দেখে? আমি সুশ্রী কি কুশ্রী সে বিষয়ে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করা রুচিবিরুদ্ধ কিন্তু এটা আমি জোর ক'রে বলতে পারি বিদ্রূপের তুলি দিয়ে বিধাতাপুরুষ আমার মুখমণ্ডল অঙ্কিত করেন নি। তবে যদি রঙটা কালো এবং চুলগুলো কিছু লম্বা দেখে হাসি পায় তাহোলে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি, প্রকৃতিভেদে হাস্যরসসম্বন্ধে অদ্ভুত রুচিভেদ লক্ষিত হয়। তোমরা যাকে "হিউমার" বলো, আমার মতে কালো রঙের সঙ্গে তার কোনো কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নেই। দেখছি বটে, তোমাদের দেশে মুখে কালি মেখে কাফ্রি সেজে নৃত্যগীত করা একটা কৌতুকের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু, কনক-কেশিনি, সেটা আমার কাছে নিতান্ত হৃদয়-হীন বর্ব্বরতা ব'লে বোধ হয়।"

২২ সেপ্টেম্বর। আজ সন্ধ্যার সময় গোটাকতক বাংলা গান গাওয়া গেল। তার মধ্যে গুটি দুই তিন এখানকার শ্রোত্রীগণ বিশেষ পছন্দ করেছেন। আশা করি, সেটা কেবলমাত্র মৌখিক ভদ্রতা নয়। তবে চাণক্য বলেছেন ইত্যাদি।

২২ সেপ্টেম্বর। আজকাল সমস্ত দিনই প্রায় জিনিষপত্র কিনে দোকানে দোকানে ঘুরে কেটে যাচ্চে। বাড়ি ফিরে এলেই

আমার বন্ধু বলেন, এসো বিশ্রাম করিগে। তার পরে খুব সমারোহে বিশ্রাম করতে যাই। শয়নগৃহে প্রবেশ ক'রে বান্ধবটি অনতিবিলম্বে শয্যাতল আশ্রয় করেন, আমি পার্শ্ববর্ত্তী একটি সুগভীর কেদারার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে বসি। তার পরে, কোনো বিদেশী কাব্যগ্রন্থ পাঠ করি, না হয়, দুজনে মিলে জগতের যত কিছু অতলস্পর্শ বিষয় আছে, দেখতে দেখতে তার মধ্যে তলিয়ে অন্তর্ধান করি। আজকাল এই ভাবে এতই অধিক বিশ্রাম করছি, যে, কাজের অবকাশ তিলমাত্র থাকে না। ড্রয়িংরুমে ভদ্রলোকেরা গীতবাদ্য সদালাপ করেন, আমরা তার সময় পাইনে, আমরা বিশ্রামে নিযুক্ত। শরীর রক্ষার জন্যে সকলে কিয়ৎকাল মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণাদি ক'রে থাকেন, সে হতেও আমরা বঞ্চিত, আমরা এত অধিক বিশ্রাম ক'রে থাকি। রাত দুটো বাজল, আলো নিবিয়ে দিয়ে সকলেই আরামে নিদ্রা দিচ্চে, কেবল আমাদের দুই হতভাগ্যের ঘুমোবার অবসর নেই, আমরা তখনো অত্যন্ত দুরূহ বিশ্রামে ব্যস্ত।

২৫ সেপ্টেম্বর। আজ এখানকার একটি ছোটোখাটো এক্‌জিবিশন্ দেখতে গিয়েছিলুম। শুনলুম, এটা প্যারিস্ একজিবিশনের অত্যন্ত সুলভ এবং সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় সংস্করণ। সেখানে চিত্রশালায় প্রবেশ ক'রে, কারোলু ড্যুরাঁ নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকররচিত একটি বসনহীনা মানবীর ছবি দেখলুম। আমরা প্রকৃতির সকল শোভাই দেখি, কিন্তু মর্ত্ত্যের এই চরম সৌন্দর্য্যের উপর, জীব-অভিব্যক্তির এই সর্ব্বশেষ কীর্ত্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অন্তরাল টেনে রেখে দিয়েছে। এই দেহখানির স্নিগ্ধ শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সুঠাম সুনিপুণ ভঙ্গিমার উপরে অসীম সুন্দরের সযত্ন অঙ্গুলির সদাস্পর্শ দেখা যায় যেন। এ কেবলমাত্র দেহের সৌন্দর্য্য নয়, যদিও দেহের সৌন্দর্য্য যে বড়ো সামান্য

এবং সাধুজনের উপেক্ষণীয় তা বলতে পারিনে—কিন্তু এতে আরো অনেকখানি গভীরতা আছে। একটি প্রীতিরমণীয় সুকোমল নারী-প্রকৃতি, একটি অমরসুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে, তারি দিব্য লাবণ্য এর সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত। দূর থেকে চকিতের মতো সেই অনির্ব্বচনীয় চির-রহস্যকে দেহের স্ফটিক বাতায়নে একটুখানি যেন দেখা গেল।

২৭ সেপ্টেম্বর। আজ লাইসীয়ম্ নাট্যশালায় গিয়েছিলুম। স্কট্ রচিত "ব্রাইড্ অফ্ লামার্‌মূর" উপন্যাস নাট্যাকারে অভিনীত হয়েছিল। বিখ্যাত অভিনেতা অভিং নায়ক সেজেছিলেন। তাঁর উচ্চারণ অস্পষ্ট এবং অঙ্গভঙ্গী অদ্ভুত। তৎসত্ত্বেও তিনি কী এক নাট্যকৌশলে ক্রমশঃ দর্শকদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করতে পারেন।

আমাদের সম্মুখবর্ত্তী একটি বক্সে দুটি মেয়ে বসে ছিল। তার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ রঙ্গভূমির সমস্ত দর্শকের চিত্ত এবং দূরবীন আকৃষ্ট করেছিল। নিখুঁৎ সুন্দর ছোটো মুখখানি, অল্প বয়স, দীর্ঘ বেণী পিঠে ঝুলছে—বেশভূষার আড়ম্বর নেই। অভিনয়ের সময় যখন সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল ষ্টেজের আলো জ্বল্‌ছিল এবং সেই আলো ষ্টেজের অনতিদূরবর্ত্তী তার আধখানি মুখের উপর এসে পড়েছিল—তখন তার আলোকিত সুকুমার মুখের রেখা এবং সুভঙ্গিম গ্রীবা অন্ধকারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল। হিতৈষীরা আমাকে পুনশ্চ মার্জ্জনা করবেন—অভিনয়কালে সেদিকে আমার দৃষ্টি বদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু দূরবীন কষাটা আমার আসে না। নির্লজ্জ স্পর্দ্ধার সহিত পরস্পরের প্রতি অসঙ্কোচে দূরবীন প্রয়োগ করা নিতান্ত রূঢ় মনে হয়।

২ অক্টোবর। একটি গুজরাটীর সঙ্গে দেখা হোলো। ইনি ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত পথ জাহাজের ডেকে চ'ড়ে এসেছেন। তখন

শীতের সময়। মাছ মাংস খান না। সঙ্গে চিঁড়ে শুষ্ক ফল প্রভৃতি কিছু ছিল এবং জাহাজ থেকে শাক সব্‌জি কিছু সংগ্রহ করতেন। ইংরেজি অতি সামান্য জানেন। গায়ে শীত বস্ত্র অধিক নেই। লণ্ডনে স্থানে স্থানে উদ্ভিজ ভোজের ভোজনশালা আছে সেখানে ছয় পেনিতে তাঁর আহার সমাধা হয়। যেখানে যা কিছু দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে সমস্ত অনুসন্ধান ক'রে বেড়ান। বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে অসঙ্কোচে সাক্ষাৎ করেন। কী রকম ক'রে কথাবার্ত্তা চলে বলা শক্ত। মধ্যে মধ্যে কার্ডিনাল্ ম্যানিঙের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা ক'রে আসেন। ইতিমধ্যে এক্‌জিবিশনের সময় প্যারিসে দুই মাস যাপন ক'রে এসেছেন এবং অবসরমতো আমেরিকায় যাবার সঙ্কল্প করছেন। ভারতবর্ষে এঁকে আমি জানতুম। ইনি বাংলা শিক্ষা ক'রে অনেক ভালো বাংলা বই গুজরাটিতে তর্জ্জমা করেছেন। এঁর স্ত্রীপুত্র পরিবার কিছুই নেই। ভ্রমণ করা, শিক্ষা করা, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করা এঁর একমাত্র কাজ। লোকটি অতি নিরীহ, শীর্ণ, খর্ব্ব, পৃথিবীতে অতি অল্প পরিমাণ স্থান অধিকার করেন। এঁকে দেখে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়।

৬ অক্টোবর। এখনো আমাদের প্রবাসের সময় উত্তীর্ণ হয় নি, কিন্তু আমি আর এখানে পেরে উঠছিনে। বলতে লজ্জা বোধ হয়, আমার এখানে ভালো লাগছে না। সেটা গর্ব্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়—সেটা আমার স্বভাবের ত্রুটি।

যখন কৈফিয়ৎ সন্ধান করি তখন মনে হয় যে, য়ুরোপের যে ভাবটা আমাদের মনে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, সেটা সেখানকার সাহিত্য ইতিহাস প'ড়ে। সেটা হচ্চে আইডিয়ল্ য়ুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেটা প্রত্যক্ষ করবার জো নেই। তিন মাস, ছ'মাস কিম্বা ছ'বৎসর এখানে থেকে আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাত পা

নাড়া দেখতে পাই মাত্র। বড়ো বড়ো বাড়ি, বড়ো বড়ো কারখানা, নানা আমোদের জায়গা; লোক চলছে ফিরছে, যাচ্চে আসছে, খুব একটা সমারোহ। সে যতই বিচিত্র, যতই আশ্চর্য্য হোক্ না কেন, তাতে দর্শককে শ্রান্তি দেয়; কেবলমাত্র বিস্ময়ের উত্তেজনা চিত্তকে পরিপূর্ণ করতে পারে না বরং তাতে মনকে সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত করতে থাকে।

অবশেষে এই কথা মনে আসে—আচ্ছা ভালোরে বাপু, আমি মেনে নিচ্চি তুমি মস্ত সহর, মস্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই। অধিক প্রমাণের আবশ্যকতা নেই। এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ ক'রে মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা করতে পারি, সহজে ভালোবাসতে পারি। যেখানে আসল মানুষটি আছে সেখানে যদি অবাধে যেতে পারতুম, তাহোলে বিদেশেও আপনার স্বজাতীয়কে দেখে এস্থানকে আর প্রবাস ব'লে মনে হোত না। কিন্তু এখানে এসে দেখি কেবল ইংরেজ কেবল বিদেশী;—তাদের চালচলন ধরণধারণ যা কিছু নূতন সেইটেই কেবল ক্রমিক চক্ষে পড়ে, যা চিরকেলে পুরাতন সেটা ঢাকা প'ড়ে থাকে; সেই জন্যে এদের সঙ্গে কেবল পরিচয় হোতে থাকে কিন্তু প্রণয় হয় না।

এইখানে কথামালার একটা গল্প মনে পড়ছে।

একটা চতুর শৃগাল একদিন সুবিজ্ঞ বককে আহারে নিমন্ত্রণ করেছিল। বক সভায় গিয়ে দেখে বড়ো বড়ো থালা সুমিষ্ট লেহ্য পদার্থে পরিপূর্ণ। প্রথম শিষ্ট সম্ভাষণের পর শৃগাল বল্‌লে "ভাই, এসো আরম্ভ ক'রে দেওয়া যাক্!" ব'লেই তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে লেহন করতে প্রবৃত্ত হোলো। বক তার দীর্ঘ চঞ্চু নিয়ে থালার মধ্যে যতই ঠোকর

মারে মুখে কিছুই তুলতে পারে না। অবশেষে চেষ্টায় নিবৃত্ত হয়ে স্বাভাবিক অটল গাম্ভীর্য্যে সরোবরকূলের ধ্যানে নিমগ্ন হোলো। শৃগাল বোধ করি মাঝে মাঝে কটাক্ষপাত ক'রে বলছিল "ভাই খাচ্চ না যে! এ কেবল তোমাকে মিথ্যা কষ্ট দেওয়াই হোলো। তোমার যোগ্য আয়োজন হয় নি!" বক বোধ করি মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েছিল "আহা সে কী কথা! রন্ধন অতি পরিপাটি হয়েছে। কিন্তু শরীর-গতিকে আজ আমার ক্ষুধা বোধ হচ্চে না।" পরদিন বকের নিমন্ত্রণে শৃগাল গিয়ে দেখেন, লম্বা ভাঁড়ের মধ্যে বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী সাজানো রয়েছে। দেখে লোভ হয় কিন্তু তার মধ্যে শৃগালের মুখ প্রবেশ করে না। বক অনতিবিলম্বে লম্বচঞ্চুচালনা ক'রে ভোজনে প্রবৃত্ত হোলো। শৃগাল বাহিরের থেকে পাত্রলেহন এবং দুটো একটা উৎক্ষিপ্ত খাদ্যখণ্ডের স্বাদগ্রহণ ক'রে নিতান্ত ক্ষুধাতুর ভাবে বাড়ি ফিরে গেল।

জাতীয় ভোজে বিদেশীর অবস্থা সেইরকম। খাদ্যটা উভয়ের পক্ষে সমান উপাদেয় কিন্তু পাত্রটা তফাৎ। ইংরেজ যদি শৃগাল হয় তবে তার সুবিস্তৃত শুভ্র রজত থালের উপর উদ্ঘাটিত পায়সান্ন কেবল চক্ষে দর্শন ক'রেই আমাদের ক্ষুধিতভাবে চলে আসতে হয়, আর আমরা যদি তপস্বী বক হই, তবে আমাদের সুগভীর পাথরের পাত্রটার মধ্যে কী আছে শৃগাল তা ভালো ক'রে চক্ষেও দেখতে পায় না—দূর থেকে ঈষৎ ঘ্রাণ নিয়েই তাকে ফিরতে হয়।

প্রত্যেক জাতির অতীত ইতিহাস এবং বাহ্যিক আচার ব্যবহারে তার নিজের পক্ষে সুবিধা কিন্তু অন্য জাতির পক্ষে বাধা। এই জন্য ইংরেজসমাজ যদিও বাহ্যতঃ সাধারণসমক্ষে উদ্ঘাটিত কিন্তু আমরা চক্ষুর অগ্রভাগটুকুতে তার দুই চার ফোঁটার স্বাদ পাই মাত্র, ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারিনে। সর্ব্বজাতীয় ভোজ কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই সম্ভব।

সেখানে, যার লম্বা চঞ্চু সেও বঞ্চিত হয় না, যার লোলজিহ্বা সেও পরিতৃপ্ত হয়।

কারণটা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হোক্ বা না হোক্, এখানকার লোকের সঙ্গে হৌ-ডু-য়ু-ডু ব'লে, হাঁ ক'রে রাস্তায় ঘাটে পর্য্যটন ক'রে থিয়েটার দেখে, দোকান ঘুরে, কলকারখানার তথ্য নির্ণয় ক'রে—এমন কি, সুন্দর মুখ দেখে আমার শ্রান্তি বোধ হয়েছে।

অতএব স্থির করেছি এখন বাড়ি ফিরব।—

৭ অক্টোবর। "টেম্‌স্" জাহাজে একটা ক্যাবিন স্থির ক'রে আসা গেল। পরশু জাহাজ ছাড়বে।

৯ অক্টোবর। জাহাজে ওঠা গেল। এবারে আমি একা। আমার সঙ্গীরা বিলাতে রয়ে গেলেন। আমার নির্দ্দিষ্ট ক্যাবিনে গিয়ে দেখি সেখানে এক কক্ষে চারজনের থাকবার স্থান; এবং আর একজনের জিনিষপত্র একটি কোণে রাশীকৃত হয়ে আছে। বাক্স তোরঙের উপর নামের সংলগ্নে লেখা আছে "বেঙ্গল সিভিল্ সার্ভিস্।" বলা বাহুল্য, এই লিখন দেখে ভাবী সঙ্গসুখের কল্পনায় আমার মনে অপরিমেয় আনন্দের সঞ্চার হয়নি। ভাবলুম, ভারতবর্ষের রোদে ঝল্‌সা শুকনো খট্‌খটে হাড়-পাকা অত্যন্ত ঝাঁঝালো ঝুনো অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে আমাকে এক জাহাজে পুরেছে! গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছি এমন সময়ে এক অল্পবয়স্ক সুশ্রী ইংরেজ যুবক ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে সহাস্যমুখে শুভপ্রভাত অভিবাদন করলেন—মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। সবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি ভারতবর্ষে যাত্রা করছেন! এঁর শরীরে ইংলণ্ডবাসী ইংরেজের স্বাভাবিক সহৃদয় ভদ্রতার ভাব এখনো সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

১০ অক্টোবর। সুন্দর প্রাতঃকাল। সমুদ্র স্থির। আকাশ পরিষ্কার।

সূর্য্য উঠেছে। ভোরের বেলা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আমাদের ডান দিক থেকে অল্প অল্প তীরের চিহ্ন দেখা যাচ্চে। অল্পে অল্পে কুয়াশার যবনিকা উঠে গিয়ে ওয়াইট্ দ্বীপের পার্ব্বত্যতীর এবং ভেণ্টনর সহর ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

এ জাহাজে বড়ো ভিড়। নিরিবিলি কোণে চৌকি টেনে যে একটু লিখব তার জো নেই, সুতরাং সম্মুখে যা কিছু চোখে পড়ে তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।

ইংরেজ মেয়ের চোখ নিয়ে আমাদের দেশের লোক প্রায়ই ঠাট্টা করে, বিড়ালের চোখের সঙ্গে তার তুলনা ক'রে থাকে। কিন্তু, এমন সর্ব্বদাই দেখা যায়, তারাই যখন আবার বিলেতে আসে তখন স্বদেশের হরিণনয়নের কথাটা আর বড়ো মনে করে না। যতক্ষণ দূরে আছি কোনো বালাই নেই, কিন্তু লক্ষ্যপথে প্রবেশ করলেই ইংরেজ সুন্দরীর দৃষ্টি আমাদের অভ্যাসের আবরণ বিদ্ধ ক'রে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে। ইংরেজ সুনয়নার চোখ মেঘমুক্ত নীলাকাশের মতো পরিষ্কার, হীরকের মতো উজ্জ্বল এবং ঘন পল্লবে আচ্ছন্ন, তাতে আবেশের ছায়া নেই। এমন ভারত সন্তান আমার জানা আছে যে নীলনেত্রের কাছেও অভিভূত এবং হরিণনয়নকেও কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না। কৃষ্ণ কেশ-পাশও সে মূঢ়ের পক্ষে বন্ধন এবং কনককুন্তলও সামান্য দৃঢ় নয়।

সঙ্গীত সম্বন্ধেও দেখা যায়, পূর্ব্বে যে ইংরেজি সঙ্গীতকে পরিহাস ক'রে আনন্দলাভ করা গেছে, এখন তার প্রতি মনোযোগ ক'রে ততোধিক বেশি আনন্দ লাভ করা যায়। এখন অভ্যাসক্রমে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে যদি চর্চ্চা করা যায় তাহোলে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশী সঙ্গীত যে আমার

ভালো লাগে সে কথার বিশেষ উল্লেখ করা বাহুল্য। অথচ দুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নেই।

১৩ অক্টোবর। একটি রমণী গল্প করছিলেন, তিনি পূর্ব্বেকার কোন্ এক সমুদ্রযাত্রায় কাপ্তেন অথবা কোনো কোনো পুরুষযাত্রীর প্রতি কঠিন পরিহাস ও উৎপীড়ন করতেন—তার মধ্যে একটা হচ্চে চৌকিতে পিন্ ফুটিয়ে রাখা। শুনে আমার তেমন মজাও মনে হোলো না এবং সেই সকল বিশেষ অনুগৃহীত পুরুষদের স্থলাভিষিক্ত হোতেও একান্ত বাসনার উদ্রেক হোলো না। দেখা যাচ্চে, এখানে পুরুষদের প্রতি মেয়েরা অনেকটা দূর পর্য্যন্ত রূঢ়াচরণ কবতে পারেন। যেমন বালকের কাছ থেকে উপদ্রব অনেক সময় আমোদজনক লীলার মতো মনে হয় স্ত্রীলোকদের অত্যাচারের প্রতিও পুরুষেরা সেই রকম স্নেহময় উপেক্ষা প্রদর্শন কবে, এবং অনেক সময় সেটা ভালোবাসে। পুরুষদের মুখের উপরে রূঢ় সমালোচনা শুনিয়ে দেওয়া স্ত্রীলোকদের একটা অধিকারের মধ্যে। সেই লঘুগতি তীব্রতার দ্বারা তাঁরা পুরুষের শ্রেষ্ঠতাভিমান বিদ্ধ ক'রে গৌরব অনুভব কবেন। সামাজিক প্রথা এবং অনিবার্য্য কারণবশতঃ নানা বিষয়ে তাঁরা পুরুষের অধীন ব'লেই লৌকিকতা এবং শিষ্টাচার সম্বন্ধে অনেক সময়ে তাঁরা পুরুষদের লঙ্ঘন ক'রে আনন্দ পান। কার্য্যক্ষেত্রে যেখানে প্রতিযোগিতা নেই সেখানে দুর্ব্বল কিঞ্চিৎ দুরন্ত এবং সবল সম্পূর্ণ সহিষ্ণু এটা দেখতে মন্দ হয় না। বলাভিমানী পুরুষের পক্ষে এ একটা শিক্ষা। অবলার দুর্ব্বলতা পুরুষের ইচ্ছাতেই বল প্রাপ্ত হয়েছে, এই জন্য যে পুরুষের পৌরুষ আছে স্ত্রীলোকের উপদ্রব সে বিনা বিদ্রোহে আনন্দের সহিত সহ্য করে, এবং এই সহিষ্ণুতায় তার পৌরুষেরই চর্চ্চা হোতে থাকে। যে দেশের পুরুষেরা কাপুরুষ তারাই নির্লজ্জভাবে পুরুষপূজাকে পুরুষের প্রাণপণ সেবাকেই স্ত্রীলোকের সর্ব্বোচ্চ

ধর্ম্ম ব'লে প্রচার করে; সেই দেশেই দেখা যায় স্বামী রিক্তহস্তে আগে আগে যাচ্চে আর স্ত্রী তার বোঝাটি বহন ক'রে পিছনে চলেছে, স্বামীর দল ফষ্টক্লাসে চড়ে যাত্রা করছে আর কতকগুলি জড়সড ঘোমটাচ্ছন্ন স্ত্রীগণকে নিম্নশ্রেণীতে পূরে দেওয়া হয়েছে, সেই দেশেই দেখা যায় আহারে বিহারে ব্যবহারে সকল বিষয়েই সুখ এবং আরাম কেবল পুরুষের, উচ্ছিষ্ট ও উদ্বৃত্ত কেবল স্ত্রীলোকের, তাই নিয়ে বেহায়া কাপুরুষেরা অসঙ্কোচে গৌরব ক'রে থাকে এবং তার তিলমাত্র ব্যত্যয় হোলে সেটাকে তারা খুব একটা প্রহসনের বিষয় ব'লে জ্ঞান করে। স্বভাবদুর্ব্বল সুকুমার স্ত্রীলোকদের সর্ব্বপ্রকার আরামসাধন এবং কষ্ট-লাঘবের প্রতি সযত্ন মনোযোগ যে কঠিনকায় বলিষ্ঠ পুরুষদের একটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ হওয়া উচিত এ তারা কল্পনা করতে পারে না—তারা কেবল এইটুকুমাত্র জানে শাসনভীতা স্নেহশালিনী রমণী তাদের চরণে তৈল লেপন করবে, তাদের বদনে অন্ন জুগিয়ে দেবে, তাদের তপ্ত কলেবরে পাখার ব্যজন করবে, তাদের আলস্যচর্চ্চার আয়োজন ক'রে দেবে, পঙ্কিল পথে পায়ে জুতা দেবে না, শীতের সময় গায়ে কাপড় দেবে না, রৌদ্রের সময় মাথায় ছাতা দেবে না, ক্ষুধার সময় কম ক'রে খাবে, আমোদের সময় যবনিকার আড়ালে থাকবে এবং এই বৃহৎ মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে যে আলোক আনন্দ সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য আছে তার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে। স্বার্থপরতা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে কিন্তু নির্লজ্জ নিঃসঙ্কোচ স্বার্থপরতা কেবল সেই দেশেই আছে যে দেশে পুরুষেরা ষোলো আনা পুরুষ নয়।

মেয়েরা আপনার স্নেহপরায়ণ সহৃদয়তা থেকে পুরুষের সেবা ক'রে থাকে এবং পুরুষেরা আপনার উদার দুর্ব্বল-বৎসলতা থেকে স্ত্রীলোকের সেবা ক'রে থাকে; যে দেশে স্ত্রীলোকেরা সেই সেবা পায় না,

কেবল সেবা করে, সে দেশে তারা অপমানিত এবং সে দেশও লক্ষ্মীছাড়া।

কিন্তু কথাটা হচ্ছিল স্ত্রীলোকের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে। গোলাপের যে কারণে কাঁটা থাকা আবশ্যক, যেখানে স্ত্রীপুরুষে বিচ্ছেদ নেই সেখানে স্ত্রীলোকেরও সেই কারণে প্রখরতা থাকা চাই, তীক্ষ্ণ কথায় মর্ম্মচ্ছেদ করবার অভ্যাস অবলার পক্ষে অনেক সময়েই কাজে লাগে।

আমাদের গোলাপগুলিই কি একেবারে নিষ্কণ্টক? কিন্তু সে বিষয়ে সমধিক সমালোচনা করতে বিরত থাকা গেল।

১৪ অক্টোবর। জিব্রল্টার পৌঁছন গেল। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্চে।

আজ ডিনর টেবিলে একটা মোটা আঙুল এবং ফুলো গোঁফওয়ালা প্রকাণ্ড জোয়ান গোরা তার সুন্দরী পার্শ্ববর্ত্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওয়ালার গল্প করছিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ নালিশের নাকিস্বরে বললেন—পাখাওয়ালারা রাত্রে পাখা টানতে টানতে ঘুমোয়। জোয়ান লোকটা বললে তার একমাত্র প্রতিবিধান লাথি কিম্বা লাঠি। পাখা-আন্দোলন সম্বন্ধে এই ভাবে আন্দোলন চল্‌তে লাগল। আমার বুকে হঠাৎ যেন একটা তপ্ত শূল বিঁধল। এইভাবে যারা স্ত্রীপুরুষে কথোপ-কথন করে তারা যে অকাতরে এক সময় একটা দিশি দুর্ব্বল মানব-বিড়ম্বনাকে ভবপারে লাথিয়ে ফেলে দেবে তার আর বিচিত্র কী? আমিও তো সেই অপমানিত জাতের লোক, আমি কোন্ লজ্জায় কোন সুখে এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাই এবং একত্রে দন্তোন্মীলন করি।—শরীরের সমস্ত রাগ কণ্ঠ পর্য্যন্ত এল, কিন্তু একটা কথাও বহুচেষ্টাতে সে জায়গায় এসে পৌঁছল না। বিশেষতঃ ওদের ঐ ইংরেজি ভাষাটা বড়োই বিজাতীয়—মনটা একটু বিচলিত হয়ে গেলেই ও ভাষাটা মনের মতো কায়দা ক'রে উঠতে পারিনে—তখন মাথার চতুর্দ্দিক হতে

রাজ্যের বাংলা কথা চাক-নাড়া মৌমাছির মতো মুখদ্বারে ভিড় ক'রে ছুটে আসে। ভাবলুম এত উতলা হয়ে উঠলে চলবে না, একটু ঠাণ্ডা হয়ে দুটো চারটে ব্যাকরণশুদ্ধ ইংরেজি কথা মাথার মধ্যে গুছিয়ে নিই। ঝগড়া করতে গেলে নিদেন ভাষাটা ভালো হওয়া চাই।

তখন মনে মনে নিম্নলিখিত মতো ভাবটা ইংরেজিতে রচনা করতে লাগলুম।

কথাটা ঠিক বটে মশায়, পাখাওয়ালা মাঝে মাঝে রাত্রে ঢুলুলে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। দেহধারণ করলেই এমন কতকগুলো সহ্য করতে হয় এবং সেইজন্যই খ্রিষ্টীয় সহিষ্ণুতার প্রয়োজন ঘটে। এবং এইরূপ সময়েই ভদ্রাভদ্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

যে লোক তোমার আঘাতের প্রতিশোধ নিতে একেবারেই অক্ষম, খপ ক'রে তার উপরে লাথি তোলা চূড়ান্ত কাপুরুষতা; অভদ্রতার চেয়ে বেশি।

আমরা জাতটা যে তোমাদের চেয়ে দুর্ব্বল সেটা একটা প্রাকৃতিক সত্য—সে আমাদের অস্বীকার করবার জো নেই। তোমাদের গায়ের জোর বড্ড বেশি—তোমরা ভারি পালোয়ান।

কিন্তু সেইটেই কি এত গর্ব্বের বিষয়, যে, মনুষ্যত্বকে তার নিচে আসন দেওয়া হবে?

তোমরা বলবে, কেন, আমাদের আর কি কোনো শ্রেষ্ঠতা নেই?

থাকতেও পারে। তবে, যখন একজন অস্থিজর্জর অর্দ্ধ-উপবাসী দরিদ্রের রিক্ত উদরের উপরে লাথি বসিয়ে দাও এবং তৎসম্বন্ধে রমণীদের সঙ্গে কৌতুকালাপ করো এবং সুকুমারীগণও তাতে বিশেষ বেদনা অনুভব করেন না, তখন কিছুতেই তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব'লে ঠাহর করা যায় না।

বেচারার অপরাধ কী দেখা যাক! ভোরের বেলা অর্দ্ধাশনে বেরিয়েছে, সমস্ত দিন খেটেছে। হতভাগা আর দুটো পয়সা বেশি উপার্জ্জন করবার আশায় রাত্রের বিশ্রামটা তোমাকে দুচার আনায় বিক্রি করেছে। নিতান্ত গরীব ব'লেই তার এই ব্যবসায়, বড়ো সাহেবকে ঠকাবার জন্যে সে ষড়যন্ত্র করেনি।

এই ব্যক্তি রাত্রে পাখা টানতে টানতে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে—এ দোষটা তার আছে বলতেই হবে।

কিন্তু আমার বোধ হয় এটা মানবজাতির একটা আদিম পাপের ফল। যন্ত্রের মতো বসে বসে পাখা টানতে গেলেই আদমের সন্তানের চোখে ঘুম আসবেই। সাহেব নিজে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন।

এক ভৃত্যের দ্বারা কাজ না পেলে দ্বিতীয় ভৃত্য রাখা যেতে পারে, কিন্তু যে কাপুরুষ তাকে লাথি মারে সে নিজেকে অপমান করে, কারণ, তখনি তার একটি প্রতিলাথি প্রাপ্য হয়—সেটা প্রয়োগ করবার লোক কেউ হাতের কাছে উপস্থিত নেই এইটুকু-মাত্র প্রভেদ।

তোমরা অবসর পেলেই আমাদের ব'লে থাকো যে, "তোমাদের মধ্যে যখন বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা প্রচলিত তখন তোমরা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে কোনো স্বাধীন অধিকার প্রাপ্তির যোগ্য নও।"

কিন্তু তার চেয়ে এ কথা সত্য যে,—যে-জাত নিরাপদ দেখে দুর্ব্বলের কাছে "তেরিয়া"—অর্থাৎ তোমরা যাকে বলো "বুলি"—যার কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই—অপ্রিয় অশিষ্ট ব্যবহার যাদের স্বভাবতঃ আসে, কেবল স্বার্থের স্থলে যারা নম্রভাব ধারণ করে, তারা কোনো বিদেশী রাজ্যশাসনের যোগ্য নয়।

অবশ্য যোগ্যতা দুরকমের আছে—ধর্ম্মত এবং কার্য্যত। এমন

কতকগুলি স্থল আছে যেখানে শুদ্ধমাত্র কৃতকারিতাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়। গায়ের জোর থাকলে অনেক কাজই বলপূর্ব্বক চালিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ বিশেষ উপযোগী নৈতিকগুণের দ্বারাই সে কার্য্যবহনের প্রকৃত অধিকার পাওয়া যায়।

কিন্তু ধর্ম্মের শাসন সদ্য সদ্য দেখা যায় না ব'লে যে, ধর্ম্মের রাজ্য অরাজক তা বলা যায় না। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্ঠুরতা এবং প্রতিদিনের ঔদ্ধত্য প্রতিদিন সঞ্চিত হচ্চে, একসময় এরা তোমাদেরই মাথায় ভেঙে পড়বে।

যদি বা আমরা সকল অপমানই নীরবে অথবা কথঞ্চিৎ কলরব সহকারে সহ্য ক'রে যাই, প্রতিকারের কোনো ক্ষমতাই যদি আমাদের না থাকে, তবু তোমাদের মঙ্গল হবে না।

কারণ, অপ্রতিহত ক্ষমতার দম্ভ জাতীয় চরিত্রের মূল আক্রমণ করে। যে স্বাধীনতাপ্রিয়তার ভিত্তির উপর তোমাদের জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত, তলে তলে সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তার বিশুদ্ধতা নষ্ট করে। সেই জন্য ইংলণ্ডবাসী ইংরেজের কাছে শোনা যায় ভারতবর্ষীয় ইংরেজ একটা জাতই স্বতন্ত্র; কেবলমাত্র বিকৃত যকৃৎই তার একমাত্র কারণ নয়; যকৃতের চেয়ে মানুষের আরো উচ্চতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে সেটাও নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু আমার এ বিভীষিকায় কেউ ডরাবে না। যার দ্বারে অর্গল নেই সেই অগত্যা চোরকে সাধুভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিতে বসে; যেন চোরের পরকালের হিতের জন্যেই তার রাত্রে ঘুম হয় না।

লাথির পরিবর্ত্তে উপদেশ দেওয়া এবং ধর্ম্মভয় দেখানো যদিচ দেখতে অতি মনোহর বটে, কিন্তু লাথির পরিবর্ত্তে লাথি দিলেই ফলটা অতি শীঘ্র পাওয়া যায়। এই পুরাতন সত্যটি আমাদের জানা আছে, কিন্তু

বিধাতা আমাদের সমস্ত শরীরমনের মধ্যে কেবল রসনার অগ্রভাগটুকুতে বলসঞ্চার করেছেন। সুতরাং হে জোয়ান, কিঞ্চিৎ নীতি কথা শোনো।

শোনা যায় ভারতবর্ষীয়ের পিলে যন্ত্রটাই কিছু খারাপ হয়ে আছে, এই জন্য তারা পেটের উপরে ইংরেজ প্রভুর নিতান্ত "পেটর্নল ট্রীটমেণ্ট"টুকুরও ভর সইতে পারে না। কিন্তু ইংরেজের পিলে কী রকম অবস্থায় আছে এ পর্য্যন্ত কার্য্যত তার কোনো পরীক্ষাই হয়নি।

কিন্তু সে নিয়ে কথা হচ্চে না; পিলে ফেটে যে আমাদের অপঘাত মৃত্যু হয় সেটা আমাদের ললাটের লিখন। কিন্তু তার পরেই সমস্ত ব্যাপারটা তোমরা যে রকম তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাও তাতেই আমাদের সমস্ত জাতিকে অপমান করা হয়। তাতেই একরকম ক'রে বলা হয় যে, আমাদের তোমরা মানুষ জ্ঞান করো না। আমাদের দুটো চারটে মানুষ যে খামকা তোমাদের চরণতলে বিলুপ্ত হয়ে যায় সে আমাদের পিলের দোষ। পিলে যদি ঠিক থাকৃত তাহোলে লাথিও খেতে, বেঁচেও থাকতে এবং পুনশ্চ দ্বিতীয়বার খাবার অবসর পেতে।

যা হোক ভদ্রনাম ধারণ ক'রে অসহায়কে অপমান করতে যার সঙ্কোচ বোধ হয় না, তাকে এত কথা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অপমান সহ্য করে দুর্ব্বল হোলেও তাকে যখন অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা না ক'রে থাকা যায় না।

কিন্তু একটা কথা আমি ভালো বুঝতে পারিনে। ইংলণ্ডে তো আমাদের এত বিশ্বহিতৈষিণী মেয়ে আছেন তাঁরা সভাসমিতি ক'রে নিতান্ত অসম্পর্কীয় কিম্বা দূরসম্পর্কীয় মানবজাতির প্রতিও দূর থেকে দয়া প্রকাশ করেন। এই হতভাগ্য দেশে সেই ইংরেজের ঘর থেকে কি যথেষ্ট পরিমাণ মেয়ে আসেন না, যাঁরা উক্ত বাহুল্য করুণরসের কিয়দংশ উপস্থিত ক্ষেত্রে ব্যয় ক'রে মনোভার কিঞ্চিৎ লাঘব ক'রে যেতে

পারেন। বরঞ্চ পুরুষমানুষে দয়ার দৃষ্টান্ত দেখেছি। কিন্তু তোমাদের মেয়েরা এখানে কেবল নাচগান করেন, সুযোগমতে বিবাহ করেন এবং কথোপকথনকালে সুচারু নাসিকার সুকুমার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত ক'রে আমাদের স্বজাতীয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। জানি না, কী অভিপ্রায়ে বিধাতা আমাদের ভারতবাসীকে তোমাদের ললনাদের স্নায়ু-তন্ত্রের ঠিক উপযোগী ক'রে সৃজন করেন নি!—

যাই হোক, স্বগত উক্তি যত ভালোই হোক ষ্টেজ ছাড়া আর কোথাও শ্রোতাদের কর্ণগোচর হয় না। তা ছাড়া যে কথাগুলো আক্ষেপবশতঃ মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল সেগুলো যে এই গোঁফওয়ালা পালোয়ানের বিশেষ কিছু হৃদয়ঙ্গম হোত এমন আমার বোধ হয় না। এদিকে, বুদ্ধি যখন বেড়ে উঠল চোর তখন পালিয়েছে—তারা পূর্ব্বপ্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য কথায় গিয়ে পড়েছে। মনের খেদে কেবল নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগলুম।

১৫ অক্টোবর। জাহাজে আমার একটি ইংরেজ বন্ধু জুটেছে। লোকটাকে লাগছে ভালো। অল্পবয়স, মন খুলে কথা কয়, কারো সঙ্গে বড়ো মেশে না, আমার সঙ্গে খুব চট ক'রে ব'নে গেছে। আমার বিবেচনায় শেষটাই সব চেয়ে মহৎ-গুণ।

এ জাহাজে তিনটি অষ্ট্রেলিয়ান কুমারী আছেন—তাঁদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। বেশ সহজ সরল রকমের লোক, কোনো-প্রকার অতিরিক্ত ঝাঁজ নেই। আমার নববন্ধু এঁদের প্রশংসাস্বরূপে বলে "They are not at all smart;" বাস্তবিক, অনেক অল্পবয়সী ইংরেজমেয়ে দেখা যায় তারা বড়োই smart—বড্ড চোখমুখের খেলা, বড্ড নাকে মুখে কথা, বড্ড খরতর হাসি, বড্ড চোখাচোখা জবাব—কারো কারো লাগে ভালো, কিন্তু শান্তিপ্রিয় সামান্য লোকের পক্ষে নিতান্ত শ্রান্তিজনক।

১৬ অক্টোবর। আজ জাহাজে দুটি ছোটো ছোটো নাট্যাভিনয় হয়ে গেল। দলের মধ্যে একটি অভিনেত্রীকে যেমন সুন্দর দেখতে তিনি তেমনি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন।

আজ অনেক রাত্রে নিরালায় একলা দাঁড়িয়ে জাহাজের কাঠরা ধ'রে সমুদ্রের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে গুন্‌গুন্‌ ক'রে একটা দিশি রাগিণী ধরেছিলুম। তখন দেখতে পেলুম অনেক দিন ইংরেজি গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন অতৃপ্ত হয়ে ছিল। হঠাৎ এই বাংলা সুরটা পিপাসার জলের মতো বোধ হোলো। আমি দেখলুম সেই সুরটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যেরকম প্রসারিত হোলো, এমন আর কোনো সুর কোথাও পাওয়া যায় ব'লে আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরেজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরেজি সঙ্গীত মানব-জগতের সঙ্গীত, আর আমাদের সঙ্গীত প্রকাণ্ড নির্জ্জন প্রকৃতির অনির্দ্দিষ্ট অনির্ব্বচনীয় বিষাদ-গভীর সঙ্গীত। কানাড়া টৌড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে যে গাম্ভীর্য্য এবং কাতরতা আছে সে যেন কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়—সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্ত্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের।

১৭ অক্টোবর। বিকালের দিকে জাহাজ মল্টা দ্বীপে পৌছল। কঠিন দুর্গপ্রাকারে বেষ্টিত অট্টালিকাখচিত তরুগুল্মহীন সহর। এই শ্যামল পৃথিবীর একটা অংশ যেন ব্যাধি হয়ে কঠিন হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখে নাব্‌তে ইচ্ছে করে না। অবশেষে আমার নববন্ধুর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে একত্রে নেবে পড়া গেল। সমুদ্রতীর থেকে সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ঘাটের মতো উঠেছে, তারি সোপান বেয়ে সহরের মধ্যে উঠলুম। অনেকগুলি গাইড্‌পাণ্ডা আমাদের ছেঁকে ধরলে। আমার বন্ধু বহুকষ্টে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু একজন কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়লে

না। বন্ধু তাকে বারবার ঝেঁকে ঝেঁকে বললেন—"চাইনে তোমাকে"—"একটি পয়সাও দেব না"—তবু সে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে লেগে ছিল। তার পরে যখন তাকে নিতান্তই তাড়িয়ে দিলে তখন সে ম্লানমুখে চ'লে গেল। আমার তাকে কিছু দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বন্ধু বললেন লোকটা গরীব সন্দেহ নেই কিন্তু কোনো ইংরেজ হোলে এমন করত না।—আসলে মানুষ পরিচিত দোষ গুরুতর হোলেও মার্জ্জনা করতে পারে কিন্তু সামান্য অপরিচিত দোষ সহ্য করতে পারে না।

মণ্টা সহরটা দেখে মনে হয় একটা অপরিণত বিকৃত য়ুরোপীয় সহর। পাথরে বাঁধানো সরু রাস্তা একবার উপরে উঠছে একবার নিচে নামছে। সমস্তই দুর্গন্ধ ঘেঁসাঘেঁসি অপরিষ্কার। রাত্রে হোটেলে গিয়ে খেলুম। অনেক দাম দেওয়া গেল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য কদর্য্য। আহারান্তে, সহরের মধ্যে একটি বাঁধানো চক আছে, সেইখানে ব্যাণ্ড বাদ্য শুনে রাত দশটার সময় জাহাজে ফিরে আসা গেল। ফেরবার সময় নৌকোওয়ালা আমাদের কাছ থেকে ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশি আদায়ের চেষ্টায় ছিল। আমার বন্ধু এদের অসৎ ব্যবহারে নিয়ম রাগান্বিত। তাতে আমার মনে পড়ল এবারে লণ্ডনে প্রথম যেদিন আমরা দুই ভাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলুম গাড়োয়ান পাঁচ শিলিং ভাড়ার জায়গায় আমাদের কাছে বারো শিলিং ঠকিয়ে নিয়েছিল। সে লোকটার তত দোষ ছিল না—দোষ আমাদেরই। আমাদের দুই ভাইয়ের মুখে বোধ করি এমন কিছু ছিল যা দেখলে সৎলোকেরও ঠকিয়ে নিতে হঠাৎ প্রলোভন হোতে পারে। যা হোক মণ্টাবাসীর অসাধু স্বভাবের প্রতি আমার বন্ধুর অতিমাত্র ক্রোধ দেখে এ ঘটনাটা উল্লেখ করা আমার কর্ত্তব্য মনে করলুম।

১৮ অক্টোবর। আজ ডিনরটেবিলে স্মগ্লিং সম্বন্ধে কেউ কেউ নিজ নিজ কীর্ত্তি রটনা করছিলেন। গবর্মেণ্টকে মাশুল ফাঁকি দেবার জন্যে মিথ্যা প্রতারণা করাকে এরা তেমন নিন্দা বা লজ্জার বিষয় মনে করে না। অথচ মিথ্যা এবং প্রতারণাকে যে এরা দূষণীয় জ্ঞান করে না সে কথা বলাও অন্যায়। মানুষ এমনি জীব! একজন ব্যারিষ্টর তার মক্কেলের কাছ থেকে পুরা ফি নিয়ে যদি কাজ না করে এবং সে জন্যে যদি সে হতভাগ্যের সর্ব্বনাশ হয়ে যায় তাহোলেও কিছু লজ্জা বোধ করে না—কিন্তু ঐ মক্কেল যদি তার দেয় ফি'র দুটি পয়সা কম দেয় তাহোলে কৌসুলির মনে যে ঘৃণামিশ্রিত আক্রোশের উদয় হয় তাকে তাঁরা ইংরেজি ক'রে বলেন "ইণ্ডিগ্নেশন্!"

১৯ অক্টোবর। আজ সকালে জাহাজ যখন ব্রিন্দিশি পৌছল তখন ঘোর বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে একদল গাইয়ে বাজিয়ে হার্প্ বেয়ালা ম্যাণ্ডোলীন্ নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সম্মুখে বন্দরের পথে দাঁড়িয়ে গান বাজনা জুড়ে দিলে।

বৃষ্টি থেমে গেলে বন্ধুর সঙ্গে ব্রিন্দিশিতে বেরোন গেল। সহর ছাড়িয়ে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পৌছলুম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাহাড়ে রাস্তা শুকিয়ে গেছে, কেবল দুইধারে নালায় মাঝে মাঝে জল দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ধারে গাছে চ'ড়ে দুটো খালি-পা ইটালিয়ান ছোকরা ফিগ পেড়ে খাচ্ছিল; আমাদের ডেকে ইসারায় জিজ্ঞাসা করলে তোমরা খাবে কি—আমরা বললুম, না। খানিক বাদে দেখি তা'রা ফলবিশিষ্ট একটা ছিন্ন অলিভ্‌শাখা নিয়ে এসে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলে, অলিভ্ খাবে? আমরা অসম্মত হলুম। তার পরে ইসারায় তামাক প্রার্থনা ক'রে বন্ধুর কাছে থেকে কিঞ্চিৎ তামাক আদায় করলে। তামাক খেতে খেতে দুজনে বরাবর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল।

আমরা পরস্পরের ভাষা জানিনে—আমাদের উভয় পক্ষে প্রবল অঙ্গভঙ্গী-দ্বারা ভাবপ্রকাশ চলতে লাগল। জনশূন্য রাস্তা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে শস্য-ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে এক একটা ছোটো বাড়ি, সেখানে জানলার কাছে ফিগ ফল শুকোতে দিয়েছে। এক এক জায়গায় ছোটো ছোটো শাখাপথ বক্রধারায় এক পাশ দিয়ে নেমে নিচে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ফেরবার মুখে একটা গোরস্থানে ঢোকা গেল। এখানকার গোর নূতন রকমের। অধিকাংশ গোরের উপরে এক-একটি ছোটো ঘর গেঁথেছে। সেই ঘর পর্দা দিয়ে ছবি দিয়ে রঙীন জিনিষ দিয়ে নানা রকমে সাজানো, যেন মৃত্যুর একটা খেলাঘর —এর মধ্যে কেমন একটি ছেলেমানুষী আছে—মৃত্যুটাকে যেন যথেষ্ট খাতির করা হচ্চে না।

গোরস্থানের একজায়গায় সিঁড়ি দিয়ে একটা মাটির নিচেকার ঘরে নাবা গেল। সেখানে সহস্র সহস্র মড়ার মাথা অতি সুশৃঙ্খলভাবে স্তূপাকারে সাজানো। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই নিশিদিন যে একটা কঙ্কাল চলে বেড়াচ্চে ঐ মুণ্ডগুলো দেখে তার আকৃতিটা মনে উদয় হোলো। জীবন এবং সৌন্দর্য্য এই অসীম জীবলোকের উপর একটা চিত্রিত পর্দা ফেলে রেখেছে—কোনো নিষ্ঠুর দেবতা যদি হঠাৎ একদিন সেই লাবণ্যময় চর্ম্মযবনিকা সমস্ত নরসংসার থেকে উঠিয়ে ফেলে, তাহোলে অকস্মাৎ দেখতে পাওয়া যায় আরক্ত অধরপল্লবের অন্তরালে গোপনে ব'সে ব'সে শুষ্ক শ্বেত দন্তপংক্তি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। পুরোনো বিষয়! পুরোনো কথা! ঐ নরকপাল অবলম্বন ক'রে নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনেক বিভীষিকা প্রচার করেছেন—কিন্তু অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে আমার কিছুই ভয় হোলো না। শুধু এই মনে হোলো, সীতাকুণ্ডের বিদীর্ণ জলবিম্ব থেকে যেমন খানিকটা তপ্ত

বাষ্প বেরিয়ে যায়, তেমনি পৃথিবীর কত যুগের কত দুশ্চিন্তা, দুরাশা, অনিদ্রা ও শিরঃপীড়া ঐ মাথার খুলিগুলোর—ঐ গোলাকার অস্থি-বুদ্‌বুদ্‌গুলোর মধ্যে থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। এবং সেই সঙ্গে এও মনে হোলো, পৃথিবীতে অনেক ডাক্তার অনেক টাকের ওষুধ আবিষ্কার ক'রে চীৎকার ক'রে মরছে, কিন্তু ঐ লক্ষ লক্ষ কেশহীন মস্তক তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, এবং দন্তমার্জ্জনওয়ালারা যতই প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচার করছে এই অসংখ্য দন্তশ্রেণী তার কোনো খোঁজ নিচ্চে না।

যাই হোক,আপাততঃ আমার নিজের কপালফলকটার ভিতরে বাড়ির চিঠির প্রত্যাশা সঞ্চরণ করছে। যদি পাওয়া যায় তাহোলে এই খুলিটার মধ্যে খানিকটা খুসির উদয় হবে, আর যদি না পাই তাহোলে এই অস্থিকোটরের মধ্যে দুঃখ নামক একটা ব্যাপারের উদ্ভব হবে—ঠিক মনে হবে আমি কষ্ট পাচ্চি।

২৩ অক্টোবর। সুয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে চলেছি। জাহাজের গতি অতি মন্থর।

উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। একরকম মধুর আলস্যে পূর্ণ আছি। য়ুরোপের ভাব সম্পূর্ণ কাটল। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্ত্তী পৃথিবীর অপরিচিত নিভৃত নদীকলধ্বনিত ছায়াসুপ্ত বাংলা দেশ, আমার সেই অকর্ম্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, কল্পনাবিষ্ট যৌবন, নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম চিন্তাপ্রিয় জীবনের স্মৃতি এই সূর্য্য-কিরণে, এই তপ্ত বায়ুহিল্লোলে সুদূর মরীচিকার মতো আমার দৃষ্টির সম্মুখে জেগে উঠেছে।

ডেকের উপরে গল্পের বই পড়ছিলুম। মাঝে একবার উঠে দেখলুম, দুধারে ধূসরবর্ণ বালুকাতীর ;—জলের ধারে একটু একটু বনঝাউ এবং অর্দ্ধশুষ্ক তৃণ উঠেছে। আমাদের ডানদিকের বালুকা-রাশির মধ্যে দিয়ে

একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট বোঝাই ক'রে নিয়ে চলেছে। প্রখর সূর্য্যালোক এবং ধূসর মরুভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং শাদা পাগড়ি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেউ বা এক জায়গায় বালুকাগহ্বরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুয়ে আছে—কেউ বা নমাজ পড়ছে, কেউ বা নাসারজ্জু ধ'রে অনিচ্ছুক উটকে টানাটানি করছে। সমস্তটা মিলে খররৌদ্র আরব মরুভূমির একখণ্ড ছবির মতো মনে হোলো।

২৪ অক্টোবর। আমাদের জাহাজের মিসেস্—কে দেখে একটা নাট্যশালার ভগ্নাবশেষ ব'লে মনে হয়। সেখানে অভিনয়ও বন্ধ, বাসের পক্ষেও সুবিধা নয়। রমণীটি খুব তীক্ষ্ণধার—যৌবনকালে নিঃসন্দেহ সেই তীক্ষ্ণতা ছিল উজ্জ্বল। যদিও এখনো এর নাকে মুখে কথা, এবং অচিরজাত বিড়ালশাবকের মতো ক্রীড়াচাতুর্য্য, তবু কোনো যুবক এর সঙ্গে দুটো কথা বলবার ছুতো অন্বেষণ করে না, নাচের সময় আহ্বান করে না, আহারের সময় সযত্নে পরিবেষণ করে না। তার চঞ্চলতার মধ্যে শ্রী নেই, প্রৌঢ়তার সঙ্গে রমণীর মুখে যে একটি স্নেহময় সুপ্রসন্ন সুগম্ভীর মাতৃভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাও তার কিছুমাত্র দেখিনে।

২৫ অক্টোবর। আজ সকালবেলা স্নানের ঘর বন্ধ দেখে দরজার সামনে অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ বাদে বিরলকেশ পৃথুকলেবর দ্বিতীয় ব্যক্তি তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হস্তে উপস্থিত। ঘর খালাস হবামাত্র সেই জন-বুল্ অম্লাবদনে প্রথমাগত আমাকে অতিক্রম ক'রে ঘরে প্রবেশ করলে। প্রথমেই মনে হোলো তাকে ঠেলে ঠুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ি, কিন্তু শারীরিক দ্বন্দ্বটা অত্যন্ত হীন এবং রূঢ় ব'লে মনে হয়, বেশ স্বাভাবিকরূপে আসে না। সুতরাং অধিকার ছেড়ে দিয়ে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম; নম্রতা গুণটা খুব ভালো হোতে পারে

কিন্তু খৃষ্টজন্মের উনবিংশ শতাব্দী পরেও এই পৃথিবীর পক্ষে অনুপযোগী এবং দেখতে অনেকটা ভীরুতার মতো। এক্ষেত্রে নাবার ঘরে প্রবেশ করতে যতটা জেদের ততটা সংগ্রামের দরকার ছিল না। কিন্তু প্রাতঃকালেই এতটা মাংসবহুল কপিশবর্ণ পিঙ্গলচক্ষু রূঢ় ব্যক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ সম্ভাবনাটা কেমন সঙ্কোচজনক মনে হোলো। স্বার্থোদ্যম জয়লাভ করে—বলিষ্ঠ ব'লে নয়—অতিমাংসগ্রস্ত কুৎসিত ব'লে।

২৬ অক্টোবর। জাহাজের একটা দিন বর্ণনা করা যাক্।

সকালে ডেক ধুয়ে গেছে, এখনো ভিজে রয়েছে। দুইধারে ডেক-চেয়ার বিশৃঙ্খলভাবে পরস্পরের উপর রাশীকৃত। খালিপায়ে রাত-কাপড় পরা পুরুষগণ কেউ বা বন্ধু সঙ্গে কেউ বা একলা মধ্যপথ দিয়ে হু হু ক'রে বেড়াচ্চে। ক্রমে যখন আটটা বাজল এবং একটি আধটি ক'রে মেয়ে উপরে উঠতে লাগল তখন একে একে এই বিরলবেশ পুরুষদের অন্তর্ধান।

স্নানের ঘরের সম্মুখে বিষম ভিড। তিনটি মাত্র স্নানাগার; আমরা অনেকগুলি দ্বারস্থ। তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হাতে দ্বারমোচনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। দশ মিনিটের অধিক স্নানের ঘর অধিকার করবার নিয়ম নেই।

স্নান এবং বেশভূষা সমাপনের পর উপরে গিয়ে দেখা যায় ডেকের উপর পদচারণশীল প্রভাতবায়ুসেবী অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষের সমাগম হয়েছে। ঘন ঘন টুপি উদ্‌ঘাটন ক'রে মহিলাদের এবং শিরঃকম্পে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শুভপ্রভাত অভিবাদন ক'রে গ্রীষ্মের তারতম্য সম্বন্ধে পরস্পরের মত ব্যক্ত করা গেল।

ন'টার ঘণ্টা বাজল। ব্রেক্‌ফাষ্ট প্রস্তুত। বুভুক্ষু নরনারীগণ সোপান-পথ দিয়ে নিম্নকক্ষে ভোজনবিবরে প্রবেশ করলে। ডেকের উপরে

আর জনপ্রাণী অবশিষ্ট নেই কেবল সারিসারি শূন্য চৌকি ঊর্দ্ধমুখে প্রভুদের জন্য প্রতীক্ষমান।

ভোজনশালা প্রকাণ্ড ঘর। মাঝে দুই সার লম্বা টেবিল, এবং তার দুই পার্শ্বে খণ্ড খণ্ড ছোটো ছোটো টেবিল। আমরা দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র টেবিল অধিকার ক'রে সাতটি প্রাণী দিনের মধ্যে তিনবার ক্ষুধা নিবৃত্ত ক'রে থাকি। মাংস রুটি ফলমূল মিষ্টান্ন মদিরায় এবং হাস্য-কৌতুক গল্পগুজবে এই অনতিউচ্চ সুপ্রশস্ত ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আহারের পর উপরে গিয়ে যে যার নিজ নিজ চৌকি অন্বেষণ এবং সেটা যথাস্থানে স্থাপনে ব্যস্ত। চৌকি খুঁজে পাওয়া দায়। ডেক ধোবার সময় কার চৌকি কোথায় ফেলেছে তার ঠিক নেই।

তারপর যেখানে একটু কোণ, যেখানে একটু বাতাস, যেখানে একটু রোদের তেজ কম, যেখানে যার অভ্যাস সেইখানে ঠেলেঠুলে টেনেটুনে পাশ কাটিয়ে পথ ক'রে আপনার চৌকিটি রাখতে পারলে সমস্ত দিনের মতো নিশ্চিন্ত।

দেখা যায় কোনো চৌকিহারা ম্লানমুখী রমণী কাতরভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করছে, কিম্বা কোনো বিপদগ্রস্থ অবলা এই চৌকি অরণ্যের মধ্যে থেকে নিজেরটি বিশ্লিষ্ট ক'রে নিয়ে অভিপ্রেত স্থানে স্থাপন করতে পারছে না—তখন পুরুষগণ নারীসহায়ব্রতে চৌকিউদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে সুশিষ্ট ও সুমিষ্ট ধন্যবাদ অর্জ্জন ক'রে থাকে।

তার পরে যে যার চৌকি অধিকার ক'রে বসে যাওয়া যায়। ধূম-সেবীগণ, হয় ধূম সেবন কক্ষে নয় ডেকের পশ্চাদ্ভাগে সমবেত হয়ে পরিতৃপ্ত মনে ধূমপান করছে। মেয়েরা অর্দ্ধনিলীন অবস্থায় কেউ বা নভেল পড়ছে, কেউ বা শেলাই করছে; মাঝে মাঝে দুই একজন যুবক ক্ষণেকের

জন্যে পাশে বসে মধুকরের মতো কানের কাছে গুন গুন ক'রে আবার চলে যাচ্চে।

আহার কিঞ্চিৎ পরিপাক হবামাত্র এক দলের মধ্যে ক্বয়ট্‌স্ খেলা আরম্ভ হোলো। দুই বালতি পরস্পর হতে হাত দশেক দূরে স্থাপিত হোলো। দুই জুড়ি স্ত্রীপুরুষ বিরোধী পক্ষ অবলম্বন ক'রে পালাক্রমে স্ব স্ব স্থান থেকে কলসীর বিড়ের মতো কতকগুলো রজ্জুচক্র বিপরীত বালতির মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। যে পক্ষ সর্ব্বাগ্রে একুশ করতে পারবে তারই জিত। মেয়ে খেলোয়াড়েরা কখনো জয়োচ্ছ্বাসে কখনো নৈরাশ্যে ঊর্দ্ধকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠছে। কেউবা দাঁড়িয়ে দেখছে, কেউবা গণনা করছে, কেউবা খেলায় যোগ দিচ্চে, কেউবা আপন আপন পড়ায় কিম্বা গল্পে নিবিষ্ট।

একটার সময় আবার ঘণ্টা। আবার আহার। আহারান্তে উপরে ফিরে এসে দুইস্তর খাদ্যের ভারে এবং মধ্যাহ্নের উত্তাপে আলস্য অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে আসে। সমুদ্র প্রশান্ত, আকাশ সুনীল মেঘমুক্ত, অল্প অল্প বাতাস দিচ্চে। কেদারায় হেলান দিয়ে নীরবে নভেল পড়তে পড়তে অধিকাংশ আনীল নয়ন নিদ্রাবিষ্ট। কেবল দুই একজন দাবা, ব্যাকগ্যামন কিম্বা ড্রাফ্‌ট্ খেলছে, এবং দুই একজন অশ্রান্ত অধ্যবসায়ী যুবক সমস্ত দিনই ক্বয়ট্‌স্ খেলায় নিযুক্ত। কোনো রমণী কোলের উপর কাগজ কলম নিয়ে একাগ্রমনে চিঠি লিখছে, এবং কোনো শিল্পকুশলা কৌতুকপ্রিয়া যুবতী নিদ্রিত সহযাত্রীর ছবি আঁকতে চেষ্টা করছে।

ক্রমে রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস হয়ে এল। তাপক্লিষ্ট ক্লান্তকায়গণ নিচে নেমে গিয়ে রুটিমাখনমিষ্টান্ন সহযোগে চা-রস পানে শরীরের জড়তা পরিহার ক'রে পুনর্ব্বার ডেকে উপস্থিত। পুনর্ব্বার যুগল মূর্ত্তির সোৎসাহ পদচারণা এবং মৃদুমন্দ হাস্যালাপ আরম্ভ হোলো। কেবল

দুচার জন পাঠিকা উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে কিছুতেই আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছে না,—দিবাবসানের ম্লান ক্ষীণালোকে একাগ্রনিবিষ্ট দৃষ্টিতে নায়ক নায়িকার পরিণাম অনুসরণ করছে।

দক্ষিণ আকাশে তপ্ত স্বর্ণবর্ণের প্রলেপ, তরল অগ্নির মতো জলরাশির মধ্যে সূর্য্য অস্তমিত, এবং বামে সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্ব হতেই চন্দ্রোদয়ের সূচনা। জাহাজ থেকে পূর্ব্বদিগন্ত পর্য্যন্ত জ্যোৎস্না-রেখা ঝিক্‌ঝিক্ করছে।

জাহাজের ডেকের উপরে এবং কক্ষে কক্ষে বিদ্যুদ্দীপ জ্বলে উঠল। ছটার সময় বাজল ডিনরের প্রথম ঘণ্টা। বেশ পরিবর্ত্তন উপলক্ষে সকলে স্ব স্ব কক্ষে প্রবেশ করলে। আধঘণ্টা পরে দ্বিতীয় ঘণ্টা। ভোজনগৃহে প্রবেশ করা গেল। সারিসারি নরনারী বসে গেছে। কারো বা কালো কাপড়, কারো রঙীন কাপড়, কারো বা শুভ্রবক্ষ অর্দ্ধ-অনাবৃত। মাথার উপরে শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যুৎ-আলোক। গুন্‌গুন্ আলাপের সঙ্গে কাঁটাচামচের টুং টাং ঠুং ঠাং শব্দ মুখরিত, এবং বিচিত্র খাদ্যের পর্য্যায় পরিচারকদের হাতে হাতে নিঃশব্দ স্রোতের মতো যাতায়াত করছে।

আহারের পর ডেকে গিয়ে শীতল বায়ু সেবন। কোথাও বা যুবকযুবতী অন্ধকার কোণের মধ্যে চৌকি টেনে নিয়ে গিয়ে গুন্‌গুন্ করছে, কোথাও বা দুজনে জাহাজের বারান্দা ধ'রে ঝুঁকে প'ড়ে রহস্যালাপে নিমগ্ন, কোনো কোনো জুড়ি গল্প করতে করতে ডেকের আলোক ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দ্রুতপদে একবার দেখা দিচ্চে একবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্চে, কোথাও বা পাঁচসাত জন স্ত্রীপুরুষ এবং জাহাজের কর্ম্মচারী জটলা ক'রে উচ্চ-হাস্যে প্রমোদকল্লোল উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলছে। অলস পুরুষরা কেউবা বসে কেউবা দাঁড়িয়ে কেউবা

অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় চুরট টানছে, কেউবা স্মোকিং সেলুনে কেউবা নিচে খাবার ঘরে হুইস্কি-সোডা পাশে রেখে চার জনে দল বেঁধে বাজি রেখে তাস খেলছে। ওদিকে সঙ্গীতশালায় সঙ্গীতপ্রিয় দুচার জনের সমাবেশে গান বাজনা এবং মাঝে মাঝে করতালি শোনা যাচ্চে।

ক্রমে সাড়ে দশটা বাজে,—মেয়েরা নেবে যায়,—ডেকের উপরে আলো হঠাৎ যায় নিবে,—ডেক্ নিঃশব্দ নির্জ্জন অন্ধকার হয়ে আসে। চারিদিকে নিশীথের নিস্তব্ধতা, চন্দ্রালোক এবং অনন্ত সমুদ্রের অশ্রান্ত কলধ্বনি।

২৭ অক্টোবর। লোহিত সমুদ্রের গরম ক্রমেই বেড়ে উঠছে। ডেকের উপর মেয়েরা সমস্ত দিন তৃষাতুরা হরিণীর মতো ক্লিষ্ট কাতর। তারা কেবল অতি ক্লান্তভাবে পাখা নাড়ছে, স্মেলিং সল্ট শুঁকছে, এবং সকরুণ যুবকেরা যখন পাশে এসে কুশল জিজ্ঞাসা করছে তখন নিমীলিত-প্রায় নেত্রপল্লব ঈষৎ উন্মীলন ক'রে ম্লানহাস্যে কেবল গ্রীবাভঙ্গী দ্বারা আপন সুকুমার দেহলতার একান্ত অবসন্নতা ইঙ্গিতে জানাচ্চে। যতই পরিপূর্ণ ক'রে টিফিন্ এবং লেবুর সরবৎ খাচ্চে, ততই জড়ত্ব এবং ক্লান্তি বাড়ছে, নেত্র নিদ্রানত ও সর্ব্বশরীর শিথিল হয়ে আসছে।

২৮ অক্টোবর। আজ এডেনে পৌঁছন গেল।

২৯ অক্টোবর। আমাদের জাহাজে একটি পার্সী সহযাত্রী আছে। তার ছুঁচোলো ছাঁটা দাঁড়ি এবং বড়ো বড়ো চোখ সর্ব্বপ্রথমেই চোখে পড়ে। অল্প বয়স। নয় মাস য়ুরোপে বেড়িয়ে বিলিতি পোষাক এবং চালচলন ধরেছে। বলে, ইণ্ডিয়া লাইক্ করে না। বলে, তার য়ুরোপীয় বন্ধুদের (অধিকাংশই স্ত্রীবন্ধু) কাছ থেকে তিনশো চিঠি এসে তার কাছে জমেছে, তাই নিয়ে বেচারা মহা মুস্কিলে পড়েছে, কখনই বা পড়বে কখনই বা জবাব দেবে। লোকটা আবার নিজে বন্ধুত্ব করতে বড়োই

নারাজ, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় বন্ধুত্ব তার মাথার উপরে অনাহূত অযাচিত বর্ষিত হোতে থাকে। সে বলে বন্ধুত্ব ক'রে কোনো "ফন্" নেই। উপরন্তু কেবল ল্যাঠা। এমন কি শত শত জর্ম্মাণ ফরাসী ইটালিয়ান এবং ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে সে "ফ্লর্ট" ক'রে এসেছে কিন্তু তাতে কোনো মজা পায়নি।

২ নবেম্বর। ভারতবর্ষের কাছাকাছি আসা গেছে। কাল বোম্বাই পৌঁছবার কথা।

আজ সুন্দর সকালবেলা। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে—সমুদ্র সফেন তরঙ্গে নৃত্য করছে, উজ্জ্বল রৌদ্র উঠেছে; কেউ ক্বয়ট্‌স্ খেলছে, কেউ নবেল পড়ছে, কেউ গল্প করছে; ম্যুজিক সেলূনে গান স্মোকিং সেলূনে তাস ডাইনিং সেলূনে খানার আয়োজন হচ্ছে, এবং একটি সঙ্কীর্ণ ক্যাবিনের মধ্যে আমাদের একটি বৃদ্ধ সহযাত্রী মরছে।

সন্ধ্যা আটটার সময় ডিলন্ সাহেবের মৃত্যু হোলো। আজ সন্ধ্যার সময় একটি নাটক অভিনয় হবার কথা ছিল।

৩ নবেম্বর। সকালে অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের পর ডিলনের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হোলো। আজ আমাদের সমুদ্রযাত্রার শেষ দিন।

অনেক রাত্রে জাহাজ বোম্বাই বন্দরে পৌঁছল।

৪ নবেম্বর। জাহাজ ত্যাগ ক'রে ভারতবর্ষে নেমে এখন আমার অদৃষ্টের সঙ্গে আর কোনো মনান্তর নেই। সংসারটা মোটের উপরে বেশ আনন্দের স্থান বোধ হচ্চে। কেবল একটা গোল বেধেছিল—টাকাকড়ি সমেত আমার ব্যাগটি জাহাজের ক্যাবিনে ফেলে এসেছিলুম, তাতে ক'রে সংসারের আবহাওয়ার হঠাৎ অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হোটেল থেকে অবিলম্বে জাহাজে ফিরে গিয়ে সেটি সংগ্রহ ক'রে এনেছি। এই ব্যাগ্ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কাল চকিতের মতো একবার

মনে উদয় হয়েছিল। মনকে তখনি সাবধান ক'রে দিলুম ব্যাগটি যেন না ভোলা হয়। মন বললে, ক্ষেপেছ! আজ সকালে তাকে বৃথা ভৎর্সনা করেছি। নষ্টোদ্ধার ক'রে হোটেলে ফিরে এসে স্নানের পর আরাম বোধ হচ্চে। এই ঘটনা নিয়ে আমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি কটাক্ষপাত করবেন সৌভাগ্যক্রমে এমন প্রিয়বন্ধু কেউ উপস্থিত নেই। সুতরাং রাত্রে যখন কলিকাতামুখী গাড়িতে চড়ে বসা গেল, তখন যদিও আমার বালিশটা ভ্রমক্রমে হোটেলে ফেলে এসেছিলুম তবু সুখনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয়নি।

৮ আশ্বিন, ১৩০০